

পৌষ ১৪১৭ : জানুয়ারি ২০১১

কবির প্রথম বই

দুশো দিলো চারশো ফেরত, বাবাকে কমল চক্রবর্তীর ভস্ম প্রথম বই-এর টাকা জোগাচ্ছে।

কৃত্তিবাস ছাপছে শঙ্খ ঘোষের প্রথম বই, এমন বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল, বই বেরোয়নি

প্রথম কবিতা প্রকাশের চারদশক পর বেরিয়েছিল সবটাই স্বপ্নের বই

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পদাতিক সাত রকম প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে

জলপাই কাঠের এসরাজ মৃদুল দাশগুপ্তের প্রথম বই নয়

যেন প্রকাশিতই হয়নি, নক্ষত্রের আলোয় নিয়ে মনে করেছিলেন হতাশ বিনয় মজুমদার

পাবলো নেরুদা তাঁর প্রথম বই নিজেই লুকোতে চাইতেন

রবীন্দ্রনাথ কি অস্বীকার করেছিলেন তাঁর মুদ্রিত প্রথম বইকে

শূন্যস্থান পূরণ

ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন রেখা

বই। প্রথম। কবির। ক্ষেত্র ছোটো হতে-হতে, একেবারে স্পেসিফিক। যা আসলে ইতিহাসের একেকটা সন্ধিক্ষণ। কো-অর্ডিনেটের নির্দিষ্ট বিন্দু। যাদের জুড়লে তৈরি হয় নিরবচ্ছিন্ন এক রেখা।

বিষয় যখন 'কবির প্রথম বই' — প্রশ্ন উঠতে পারে, কবি যদি শুরুতে গদ্যের বই লিখে থাকেন? কিংবা আদপে গদ্যকার, কিন্তু প্রথম বই কবিতার? এসব প্রশ্ন আছে, উত্তরও আছে মিলেমিশে। আমরা মুখ্যত বলতে চেয়েছি, কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ব্যতিক্রমও তো দু-একটা আছে বটেই।

বাংলা ভাষায় নিজের কাব্যগ্রন্থ বহু ক্ষেত্রেই নিজের খরচে হয়। দীর্ঘদিন ধরেই। এজন্য, মানে, প্রকাশক মেলেনি বলে কেউ-কেউ একটু নিচু স্বরে কথা বলেন, কেউ এসবের তোয়াক্কাই করেন না। বোঝা গেল, গলার ওঠা-নামা কোনো নির্দেশিকা নয়। ঘটনামাত্র। প্রকাশক না-থাকা — সিস্টেমের দৈন্য, কবির নয়। কবিতার তো নয়ই।

অবশ্য, বাংলায় নিজের টাকায় নিজের বই বের করা যায় বলে, যা-ইচ্ছে বই-ও করা যায়। যে কেউ-ই করতে পারেন। ভালো-মন্দের প্রশ্ন নয়, লক্ষণীয় এটুকুই যে এই সম্ভাবনা প্রথম বই-এর ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও বেশি কাজ করছে। তবে, প্রকাশক না-পেলেই কি শুধু অকাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়!

ঠিক ছিল, সেই অতীত থেকে এই শূন্য দশক পর্যন্ত বাঙালি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থের একটা ডিটেইল্ড তালিকা এ সংখ্যায় থাকবে। উল্লেখযোগ্য কবির গুরুত্বপূর্ণ প্রথম বই তো বটেই, অচেনা কবির উঁচু মানের প্রথম বই-ও। বড়ো কবির দুর্বল প্রথম প্রয়াসটিও কি নয়? বারো আনা কাজ হয়েও গিয়েছিল, কিন্তু যথাসময়ে শেষ করা গেল না। সরি।

কবির প্রথম বই-এর তালিকা আরও দীর্ঘ হোক। সবচেয়ে নিখুঁত তালিকাটিকে ব্যাক ডেটেড প্রমাণ করে পরদিন প্রকাশিত হোক নতুন কবির নতুন বই।

কাগজের ছাপাই-কম্পোজ যাঁরা করেন, ব্যবসায়িকভাবেই করেন। টাকা নেন, বদলে কাজ তুলে দেন। বড়ো জোর, আমাদের দায়িত্বও কিছুটা ভাগ করে নেন। কিন্তু, এই একরৈখিক সমীকরণে বোধহয় সবটা ধরা পড়ে না।

এবারের *বোধশব্দ*-র কাজ তখন চূড়ান্ত অবস্থায়। মেশিনের সামনে আমাদের বর্ণসংস্থাপক শৈবাল ঘোষ। সাদা সুতির কাপড়ে আর উসকো-খুসকো চুলে। তাঁর স্বর্গীয় পিতার শান্তি কামনা করি।

সম্পাদক ও প্রকাশক : সুস্নাত চৌধুরী

সহ-সম্পাদকমণ্ডলী : সম্বিত পাল ও জয়িতা দাশগুপ্ত
যোগাযোগ : ৪৭/১ ষষ্ঠীতলা লেন, ভদ্রকালী, হুগলি
পশ্চিমবঙ্গ, সূচক : ৭১২২৩২ □ চলভাষ : ৯৩৩০৯ ৪৪৪৪২
বৈদ্যুতিন বার্তা : bodhshabdo@gmail.com
অক্ষরবিন্যাস : শৈবাল ঘোষ, উত্তরপাড়া
মুদ্রণ : ডায়মন্ড আর্ট প্রেস, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কল-৬৯
বন্ধুত্বে : অতীন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক মল্লিক, বরুণ চট্টোপাধ্যায়
দেবক বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক মুখোপাধ্যায়, অভিষেক ভৌমিক
দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, বিশ্বজিৎ পাল, প্রসূন মজুমদার
সিদ্ধার্থ দে, শৈবাল মুখোপাধ্যায় ও উত্তরপাড়া সিনে ক্লাব

কবির প্রথম বই

দুশো দিলে চারশো ফেরত, বাবাকে কমল চক্রবর্তীর ভুজুং প্রথম বই-এর টাকা জোগাড়ে
কৃত্তিবাস ছাপছে শঙ্খ ঘোষের প্রথম বই, এমন বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল, বই বেরোয়নি
প্রথম কবিতা প্রকাশের চারদশক পর বেরিয়ে ছিল রবার্ট ফ্রস্টের বই
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পদাতিক সাত রকম প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে
জলপাই কাঠের এসরাজ মৃদুল দাশগুপ্তের প্রথম বই নয়
যেন প্রকাশিতই হয়নি, নক্ষত্রের আলোয় নিয়ে মনে করেছিলেন হতাশ বিনয় মজুমদার
পাবলো নেরুদা তাঁর প্রথম বই নিজেই লুকোতে চাইতেন
রবীন্দ্রনাথ কি অস্বীকারই করেছিলেন তাঁর মুদ্রিত প্রথম বইকে

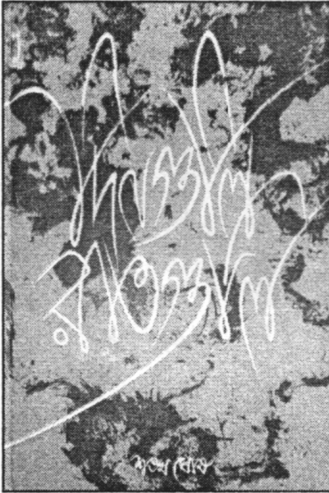
বন্ধুত্বের ইতিহাস

শঙ্খ ঘোষ

কৃত্তিবাস পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যাটা সবে বেরিয়েছে, ১৯৫৪ সাল সেটা, নিকট বন্ধুরা অনুযোগ জানাতে শুরু করল : 'বই বেরোচ্ছে, অথচ আমাদের একটু বলনি!' বই বেরোচ্ছে? আমার? শুনে চমক লাগে। বেরোচ্ছে যে, সে তো আমিই জানি না! অন্যদের কীভাবে আর বলব তবে?

রহস্যের উন্মোচন হল পত্রিকাটা হাতে পেয়ে। তার পেছনমলাটে পাতাজোড়া সুবিন্যস্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানতে পারি যে 'কৃত্তিবাস প্রকাশনীর দ্বিতীয় পরিবেশন' হিসেবে নাকি আমার 'ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে' শিগগিরই। আশ্চর্য কথা! বই ছাপাবার তখন তো কোনো ইচ্ছে ছিল না আমার। ছড়ানো লেখাগুলোকে একত্র করল কে বা কারা? আর করলই যদি কেউ, আমি তা জানতেই পাইনি কেন তবে?

সম্পাদকদের মধ্যে একজন তখনও ছিল দীপক। পথচলতি তার সঙ্গে একদিন দেখা হতেই জিজ্ঞেস করি ও-বিজ্ঞাপনের মানে। দীপক তার অভ্যস্ত বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলে যে ও-নিয়ে আমার ভাববার কিছু নেই। *কৃত্তিবাস* বেরোবার আগে থেকেই আমার কবিতার খাতাটা রয়ে গেছে দীপকের হাতে, কোনো সময়ে সেটা সে দিয়ে এসেছিল আবু সয়ীদ আইয়ুবকে এবং ওঁরই নির্বাচনমতো প্রেসে চলে গেছে পাণ্ডুলিপি। বই বেরোলেই দেখতে পাব আমি।



খামখেয়ালি দীপকের চালচলন ইচ্ছে-অনিচ্ছের বদল হয়ে যেত প্রায়ই। একদিন শুনতে পাই *কৃত্তিবাস*-এর সম্পাদনার সঙ্গে সত্যিকারের কোনো যোগ আর তার নেই, নাম যদিও থাকছে। চতুর্থ-পঞ্চম যুগ্মসংখ্যায় ঘোষণা দেখা যাচ্ছে, 'কৃত্তিবাস প্রকাশনীর দ্বিতীয় বই' নাকি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের *অতলান্ত*। ভালোই হল, চুকে গেল তবে ব্যাপারটা।

কিন্তু মুশকিল হল কয়েকমাস পর। সুনীলের এক দীর্ঘ এবং চমকপ্রদ চিঠি এসে পৌঁছল আমার হাতে, বিজ্ঞাপিত আমার বইটিই সে-চিঠির বিষয়। সুনীল তাতে জানিয়েছেন, কত কষ্ট করে ব্যক্তিগত ট্যুইশানির টাকায় ছাপানো হয় *কৃত্তিবাস*, কোনো প্রকাশনী করবার সামর্থ্য তার নেই। কবিরা যদি কেউ বই ছাপাতে চান, তাঁরা নিজের টাকায় নিজের উদ্যমেই করেন সেটা, নামটাকে শুধু ব্যবহার করবার অনুমতি দেয় *কৃত্তিবাস*। সুনীল লিখেছেন : 'আমি জানি না দীপকের সঙ্গে আপনার ঠিক কী কথাবার্তা হয়েছিল, আর দীপকেরও এখন আর দেখা মিলছে না, সে এখন অন্য খেয়ালে মেতেছে'। সমস্যাটা কী? সমস্যা হল, একটা প্রেসে ও-বই অংশত ছাপা হয়ে পড়ে আছে, প্রেস তাগাদা দিচ্ছে তার বকেয়া টাকার জন্য, তা নইলে হাত দেবে না পরের অংশে। এ-অবস্থায় কী করণীয়? দীর্ঘ চিঠিটির শেষে সহৃদয়ভাবে একথা লিখতে সুনীল ভোলেননি যে, যদি কোনোদিন *কৃত্তিবাস*-এর নিজেরই সামর্থ্য হয় কোনো বই প্রকাশের, তাহলে তার প্রথম বইটিই যে হবে আমার এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

চিঠি পড়ে আমি স্তম্ভিত। কুণ্ঠিতভাবে জানাই এ নিয়ে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞতার কথা, ব্যক্তিগত উদ্যমে বইপ্রকাশে আমার ঐকান্তিক অনিচ্ছের কথা। জানিয়ে দিই পরবর্তী অংশ ছাপার আয়োজন যেন বন্ধ করা হয় এখনই এবং সেইসঙ্গে এ-ও বলি যে প্রেসের বকেয়া টাকাটা যেমন করে হোক মিটিয়ে দেব আমি। তা অবশ্য করতে হয়নি আমায়। অজ্ঞাতসারে শুরু হওয়া আমার প্রথম বইটির সুজ্ঞাত একটা অপঘাত ঘটল এইভাবেই।

কিন্তু ওই কাহিনি জেনে আমার ঘনিষ্ঠ এক সহপাঠী বন্ধু কমলরঞ্জন রায়ের একটা জেদ তৈরি হল। উপেন্দ্রকিশোর-পরিবারের ডালপালার একজন ছিল সে। বইটি নাকি সে-ই বার করবে। 'তুমি? কীভাবে?' কমল বলে তাদের এক পারিবারিক প্রকাশনা আছে, প্রধানত সংস্কৃত বইপত্র ছাপা হয় সেখান থেকে। কিন্তু তাতে আর কী এসে যায়, কবিতার বই-ই বা নয় কেন!

ততদিনে আমরা পৌঁছে গেছি ১৯৫৫ সালে। ছাত্রজীবন সাঙ্গ করে জীবিকায় এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ছি এক-একজন। বন্ধুরা কেউ-কেউ জানতে চান কমলের সেই প্রকাশব্যবস্থার পরিণতি। লজ্জা পাবে ভেবে কখনোই তাকে জিজ্ঞেস করি না সেটা। কাজ নিয়ে চলে যাই দূরে। বই-এর ভাবনা মনেও নেই আর। কবিতাও আর লিখব না বলে ভাবি। এমন সময়ে একদিন, ১৯৫৬ সালের শেষদিকে, ডাকে একটা প্যাকেট এসে পৌঁছয় বহরমপুরে। খুলে দেখি, গভীর নীলাভ প্রচ্ছদে, বড়ো-বড়ো রেখার সুদৃশ্য নামাঙ্কনে, সুমুদ্রিত দশখানা বই : *দিনগুলি রাতগুলি*।

অন্তর্গত লেখাগুলি যেমনই হোক, বহিরঙ্গের সুঠামতা দেখে মুগ্ধ মনে ভাবি, কতদিনের অদর্শনের মধ্যে কাজটা ঠিকই নিষ্ঠায় নিয়ে করে তুলেছে কমল!

সেই কমল আর নেই। কিন্তু চলে যাবার কয়েক বছর আগে, বহুকালের দূরত্ব পেরিয়ে, একদিন এসে হাজির হয়েছিল হঠাৎ। পুরোনো দিনের অনেক স্মৃতিচর্চার পর সে হাতে তুলে দিল ছোটো একটা প্যাকেট। বলল : 'প্রকাশনা তো উঠে গেছে অনেকদিন, কিন্তু সেদিন হঠাৎ কাগজপত্র গোছাতে গিয়ে হাতে পেয়ে গেলাম পাঁচখানা *দিনগুলি রাতগুলি*, পঞ্চাশ বছর পর। নিয়ে এলাম, যদি তোমার কোনো কাজে লাগে।'

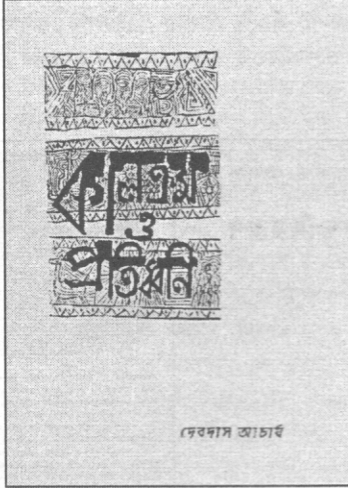
এইসব পরম বন্ধুত্বের ইতিহাসই শুধু জড়িয়ে আছে আমার প্রথম বইটির সঙ্গে।

কাল ও ক্রমে প্রতিধ্বনি

দেবদাস আচার্য

আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম *কালক্রম ও প্রতিধ্বনি*। মহালয়া ১৩৭৭ তথা অক্টোবর ১৯৭০-এ নিজ উদ্যোগে প্রকাশিত। প্রকাশক *অজ্ঞাতবাস* পত্রিকার সম্পাদক ও কবি অরুণ বসু। প্রচ্ছদ আমার নিজের করা। এই গ্রন্থের কবিতাগুলির বেশিরভাগই নদিয়ার পলাশিপাড়া নামক এক গ্রামে, আমার কর্মস্থলে, মেসে বসে রচিত। তখন অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে কর্মস্থল ছিল ওই পলাশিপাড়া। আমার বাড়ি কৃষ্ণনগর শহরে। অর্থাৎ শহর এবং গ্রাম দুই-ই আমার এ কাব্যগ্রন্থের বিষয় বা মর্মবস্তু হয়েছে। যে সময়ে এ গ্রন্থের কবিতাগুলি রচিত, সেই সময়টা ছিল অদ্যাবধি আমার জীবৎকালের সর্বাধিক আলোড়িত সময়। খুব সংক্ষেপে সময়টা ছিল — বিপন্নতার দশক। মানবতার অসম্মানের দশক। নিয়ত ভাঙচুর চলছে।

কংগ্রেস ভেঙে দু-টুকরো হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে সিপিআই, সিপিআই (এম), সিপিআই (এমএল) — এই তিন টুকরো হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও জোরদার আন্দোলন চলছে। বিক্ষুব্ধ বা ক্ষুৎ প্রজন্ম, হাংরি জেনারেশন (*ক্ষুধার্ত* পত্রিকা), *শ্রুতি*, *নিম সাহিত্য* — ইত্যাদি পত্রিকার নামে শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য (কবিতা, গদ্য) আন্দোলন ইত্যাদি। চিন-ভারত যুদ্ধ, নিবর্তনমূলক আটক আইনে ধরপাকড়, তিনবার কংগ্রেস-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট এবং ভেঙে যাওয়া, ফ্রন্ট রাজনীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর আঘাত নামার ফলে



তরুণ সমাজে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অনীহা বাড়ছে। পুলিশ, সন্ত্রাস, কারফিউ, চিরুনি তল্লাশি, 'এনকাউন্টার' — তরতাজা তরুণদের মৃত্যু, আছড়ে পড়া নকশালবাড়ি আন্দোলন, পরিকল্পিত হত্যালীলা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দানবীয় চেহারা, অনাচার, গণতান্ত্রিক চেতনার ওপর আঘাত, রাজ্যপাল ধর্মবীর এবং যুক্তফ্রন্টের স্পিকার সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চমকে দেওয়ার মতো টক্কর, ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনে তোলপাড় কৃষ্ণনগর শহর, ১৯৬৭ সালে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি, লঙ্গরখানা। ১৯৬৬ সালে ভিয়েতনামে আক্রান্ত হয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে হো চি মিন-এর নেতৃত্বে মরণপণ লড়াই, পৃথিবীর দখলদারি নিয়ে আমেরিকা ও রাশিয়ার শীতল যুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বের অসহায় অবস্থা (তখনও 'তৃতীয় বিশ্ব' — এমন এক বিশ্বধারণা চিন্তাশীলদের মধ্যে চালু ছিল) — তো, এইরকম সময় আর কি! এই সময়েই লেখা (১৯৬৬-১৯৭০) আমার *কালক্রম ও প্রতিধ্বনি* কাব্যগ্রন্থটি। ফলে ওই সময়কালে, বলা যায় আমার প্রথম যৌবনে (চব্বিশ থেকে সাতাশ বছর বয়স) আমাকে অনেকটাই বহির্মুখী করেছিল। একরকম সমাজমনস্কতা, রাজনৈতিক নৈতিকতা, দ্রোহ, বৈপ্লবিক রোমান্টিকতা — এসব তৈরি হয়েছিল। ভাবতাম, ভারতবর্ষের মতো হতদরিদ্র কৃষিপ্রধান অনুন্নত দেশের পক্ষে সমাজবাদ বা সাম্যবাদ ছাড়া নিস্তার নেই। মনে হত — দেশে কোনো পুঁজির বিকাশ ঘটেনি, শিল্প গড়ে ওঠেনি, এক চরম সেকেলে কৃষি ও চাষ-আবাদ প্রথায় জর্জরিত এ দেশে সামন্ত প্রভু ও দেশীয় রাজা-রাজড়ারাই সর্বেসর্বা, সংবিধান তারাই দখল করে আছেন — ইত্যাদি। গ্রামীণ কৃষি ও চাষাবাদ-নির্ভর জীবন আমাকে খুব টানত। আলোচ্য গ্রন্থে *সে নিড়িনি চালায় শস্যে* এবং *আমার জলের পোকা* নামে দুটো কবিতায় তার একটু ছোঁয়া আছে। লিখেছিলাম অনেক, কিন্তু বাকি কবিতা নষ্ট করে ফেলেছি। এ ছাড়া গ্রামীণ শ্রমজীবী ও দরিদ্র মানুষ নিয়েও কিছু কবিতা আছে। বইটাতে আমার বৈপ্লবিক রোমান্টিকতার আভাসও বেশ স্পষ্টভাবে আছে। প্রথম কবিতাটিতে তো বিশ্বের সে সময়ের শীতল যুদ্ধের স্পষ্ট আভাস রয়েছে। — তো এই হল ব্যাপার। পাঠকই বরং পড়ে বিচার করবেন।

তার মানে, যাকে বলে অন্তর্মুখী লিরিক কবিতা, তা নয় এ বই-এর কবিতাগুলো। একটু উচ্চরোল, একটু আহত আত্মার উন্মাদ বহিঃপ্রকাশ, একটু ঋজু এবং বক্তব্যপ্রধান। — এসব কি কবিতা হতে পারে? এ প্রশ্ন তখনও ছিল। কিন্তু আমি অনন্যোপায় ছিলাম। হাংরিদের পছন্দ করেও সে পথে হাঁটার ইচ্ছা বা সাহস পাইনি, শুদ্ধবাদীদের শ্রদ্ধা করেও নিরুপায়ভাবে এক নতুন ফাঁদে পা ফেলেছি। তাই আমি এ গ্রন্থটিকে সে যুগের কাব্যচর্চার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা স্বতন্ত্র বলে মনে করি। তবে বলার কথা এই যে, যাঁরা পড়েছেন তাঁরা বইটিকে এতৎসত্ত্বেও বর্জন করেননি। বরং কেউ-কেউ কাব্যশৈলীর ব্যাপারে বেশ একটু সম্মতিসূচক মাথা নেড়েছেন, বা স্বীকৃতি দিয়েছেন। — এই আর কি।

বইটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ছাপান্ন। মূল্য তিন টাকা। বোর্ড বাঁধাই। প্রচ্ছদের রং ছিল ম্যাজেন্টা।

অন্ধস্কুলে ঘন্টা যখন বেজেছিল

দেবারতি মিত্র

প্রথম বই-এর কথা ভাবতে গিয়ে আজ আমার লেখালিখি শুরুর দিনগুলির কথা মনে পড়ছে। একটি আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ের স্বপ্ন, যন্ত্রণা, ভ্রান্তি, উন্মাদনা, নিঃসীম কৌতূহলের অসংখ্য লতাপাতাময় জলছবি জড়িয়ে থাকত প্রতিদিনকার সূর্যের গায়ে। সেই বাসনা-কল্পনায় মেশা সব মুহূর্ত, ঝোড়ো উচ্ছ্বাস আর কখনো ফিরে আসবে না। কিন্তু আরেকটা দিকও ছিল — সাধারণ মেয়েদের তুলনায় আমি খুব মোটা ছিলাম বলে ছেলেবেলা থেকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভয়ে স্কুল-কলেজে নিয়মিত যেতে চাইতাম না। তখন কলেজে পড়ি — বন্ধুহীন, আত্মঅবমাননায় জীবনের ভার বহন করা একেক সময় অসহ্য মনে হত। কিন্তু শুধু কি এইটুকু? তা নয়। নিঃসঙ্গতা যেমন ছিল, তেমন ছিল মা-বাবা ঠাকুমা কাকাদের ভাইবোনেদের ওম মেশানো নিশ্চিন্ত এক বাড়ি। সেখানে বাগানে মাধবীলতা গন্ধরাজ স্থলপদ্ম কামিনী আমকাঁঠাল গাছ, কাগজিলেবুর বন। পড়ার ঘরে কাচের আলমারি-ভর্তি অনেক কবিতার বই, গল্পের বই, সাহিত্যের বই। নিজের মনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতাম বলে কলেজের পড়া ফাঁকি দিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত বাংলা ইংরিজি কবিতা পড়তাম। বাগান থেকে ভেসে আসত মেঘটগর ফুলের একটানা সুগন্ধ। কী যে ভালো লাগত! যেন সব দরজা-জানালা খুলে যেত। কিন্তু মাঝে-মাঝে এক হীনমন্যতাবোধ আমাকে পাগল করে দিত। আমি যে কারো সঙ্গে তেমন করে মিশতে পারি না, স্বচ্ছন্দভাবে কোথাও যেতে পারি না, অসুন্দর চেহারা, মুখচোরা অপ্রতিভ স্বভাব আমার জীবনে যে কত বড়ো বাধা।



একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচবার জন্য, নিজের কাছে নিজেকে মানুষ বলে বিশ্বাস করাবার জন্য ছোটো রুল-টানা খাতায় মনের কথা একটু-আধটু লিখতে চেষ্টা

করি। যা ভাবি, হুবহু সেভাবে নয়, অন্যরকম হয়ে আসে তারা। এইভাবে *অন্ধস্কুলে ঘন্টা বাজে*-র কবিতাগুলি লেখা হয়। ওই সময়কার অকৃতার্থতা, বিষাদ, প্রেম, বিকর্ষণ, সঙ্গহীনতা ও মৃত্যুচিন্তা ছাপ রেখে গেছে কবিতাগুলিতে। আমার প্রথম কবিতা ছাপা হয় *কৃত্তিবাস*-এ, তারপর সাপ্তাহিক *দেশ*, *কবি* ও *কবিতা*, *পাহাড়তলী*, *অজ্ঞাতবাস*, *দৈনিক কবিতা*, *সখীসংবাদ* ইত্যাদিতে।

অনেক লেখা জমে গেলে বই বার করবার ইচ্ছা হয়। ছাপাখানা থেকে কী করে বই বার করতে হয়, কিছুই জানতাম না, কিন্তু সেটা কোনো সমস্যাই হল না। ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তির মতো নির্মলকুমার খাঁ এসে হাজির হলেন, তিনি *শতরূপা* নামে একটি সিরিয়াস সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। নির্মলকুমার খাঁ — শম্ভু রক্ষিত প্রমুখ কোনো-কোনো তরুণ কবির বই বার করে দিয়েছিলেন। তিনি এসে আমাকে বললেন — 'আমি আপনার কবিতার বই প্রকাশ করতে চাই'। ব্যাপারটা আমার কাছে এতই অপ্রত্যাশিত ছিল যে আমি হকচকিয়ে গিয়ে বলে ফেললাম — 'আমি একটু ভেবেচিন্তে আপনাকে পরে জানাব'। যাই হোক, ১৯৭১ সালে *শতরূপা* থেকে আমার প্রথম বই *অন্ধস্কুলে ঘন্টা বাজে* বেরোল। বই-এর মুদ্রণ-সৌকর্য ও প্রোডাকশন সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান না থাকাতে আটচল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে ছাপ্পান্নটি লেখা আমি ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। নির্মলবাবু কী করে পাঠকদের কাছে বইটি পৌঁছে দিয়েছিলেন জানি না, কিন্তু পাঠকদের কাছ থেকে অনেক উৎসাহভরা সহৃদয় চিঠিপত্র পেয়েছিলাম।

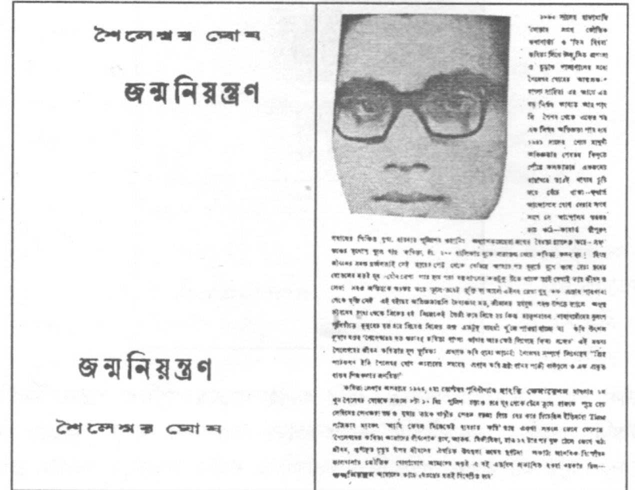
প্রথম বই বেরোবার পর বাইরের বাতাস আচমকা আমার ঘরে ঢুকে পড়ল। তরুণ কবি ও লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের সঙ্গে জোর আড্ডা জমে উঠল ডাকবিভাগের সহায়তায়, কেউ-কেউ আমাদের বাড়িতেও আসতেন। *অন্ধস্কুলে ঘন্টা বাজে* প্রকাশিত হয়ে আমার মনের গুমরোনো ভাব অনেকটা কাটিয়ে দিল। সমধর্মী, সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এই বন্ধুত্ব আমার জীবনে প্রায় প্রথম ঘটল। *পরমা*-র সম্পাদক মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁর পত্রিকায় *অন্ধস্কুলে ঘন্টা বাজে*-র একটি আলোচনা লেখেন এবং আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আলাপ-পরিচয়ের পরে গাঢ় সাহিত্যপ্রীতির সূত্রেই প্রধানত আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং বিবাহ হয়। সেইদিক থেকেও আমার প্রথম কবিতার বইটি আমার কাছে বিশেষ দামি ও স্মরণযোগ্য। *অন্ধস্কুলে ঘন্টা বাজে*-র পরও আমার কয়েকটি কবিতার বই বেরিয়েছে, কিন্তু সেদিনকার শিহরণ, উত্তেজনা, আনন্দ স্বভাবতই আর খুঁজে পাইনি।

আমার প্রথম বই : জন্মনিয়ন্ত্রণ

শৈলেশ্বর ঘোষ

১৯৬৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি জীবনানন্দ দাশের প্রথম জন্মদিন পালনের সিদ্ধান্ত নেয় হাংরি কবি-লেখকরা। ঠিক হয়, আমার প্রথম বই *জন্মনিয়ন্ত্রণ*-ও প্রকাশিত হবে ওই একই অনুষ্ঠানে। মঞ্চ, একটি শুঁড়িখানা — খালাসিটোলা। যেখানে বিদেশি জাহাজের খালাসি থেকে মজুর রিকশাওয়ালা গুন্ডা এবং কলকাতার লেখক-কবিদের বড়ো একটা অংশ খাঁটি বাংলা মদ খেতে আসতেন। সেসময় হাংরিদের দাপটে কৃত্তিবাসীরা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হল শহরের নামি লোকদের, লেখক-কবিদের এবং সমস্ত কাগজের সাংবাদিকদের। জীবনানন্দ সভাপতি। উপস্থিত হাংরি কবি-লেখক সবাই, অন্যেরা নেই আর আছে সাংবাদিককুল। জীবনানন্দ-পূজার পর একে-একে সকলে পড়লেন *জন্মনিয়ন্ত্রণ*-এর কবিতা। প্রচুর মদ্যপান, গোটা খালাসিটোলার সে এক আনন্দে উন্মত্ত অবস্থা। বইটার আবির্ভাব এভাবেই ঘটল। কিন্তু কাগজগুলি লিখল, 'উঠতি গুন্ডার দল', 'শুঁড়িখানায় কবিতাকে হত্যা' — তবে *দ্য স্টেটসম্যান* ভালো কভারেজ দিয়েছিল, প্রায় দীর্ঘ দু-কলাম-ব্যাপী। তখনকার নামি কবি-লেখক এবং জীবনানন্দের বন্ধুরা খুবই রাগ করেছিলেন।

১৯৬৮-তে বইটা প্রকাশ পেলেও এর মূল কবিতাটি, *ঘোড়ার সংগে ভৌতিক কথাবার্তা* লেখা হয় বাষট্টির শেষে বা তেষট্টির প্রথমে। কিন্তু এটা বেরিয়েছিল *এষণা* পত্রিকায়। তখন শক্তি হাংরি জেনারেশন তৈরি করেছেন তার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে, মাঝে ছিল মলয় এবং বাসুদেব। তখন যে-কেউ হাংরি নামে লিফলেট বের করে বাজারে ছাড়ত। আমি ওই *ঘোড়ার সংগে ভৌতিক কথাবার্তা*-র একটা অংশ ৩ *বিধবা* — ওইরকম একটা হাংরি লিফলেটে ছেপে বের করলাম। পুলিশ একে অশ্লীল ঘোষণা করে নিয়মিত কফি হাউসে কারা-কারা বসে দেখতে আসতে লাগল। শক্তি হাংরির সম্পর্ক ত্যাগ করল — বন্ধ হয়ে গেল হাংরি। সেদিন তো সাহিত্যে যৌনতার জন্যই আমরা গ্রেপ্তার হয়েছিলাম। কথাগুলি বললাম এজন্যই যে *জন্মনিয়ন্ত্রণ*-এর ওই কবিতাই বাংলা কবিতায় সরাসরি যৌনতার দরজা খুলে দেয়।

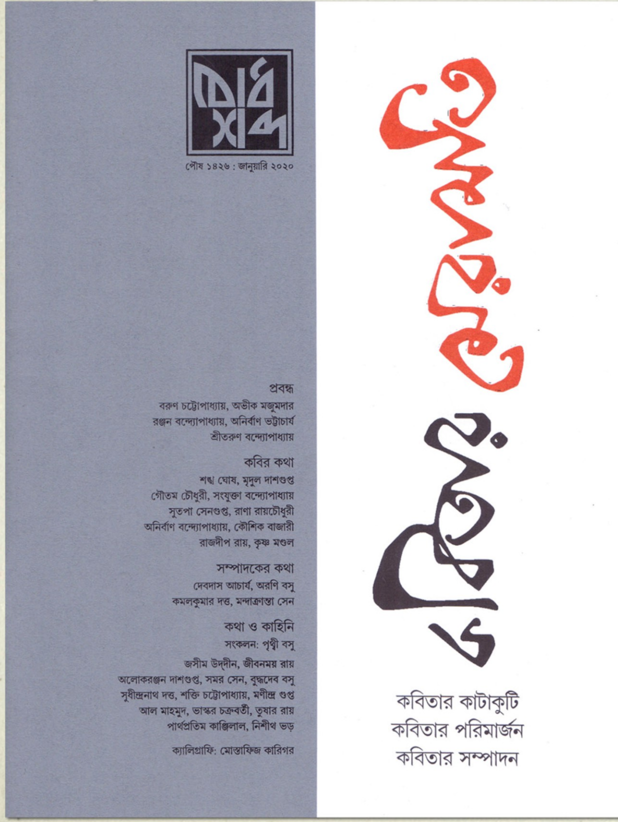


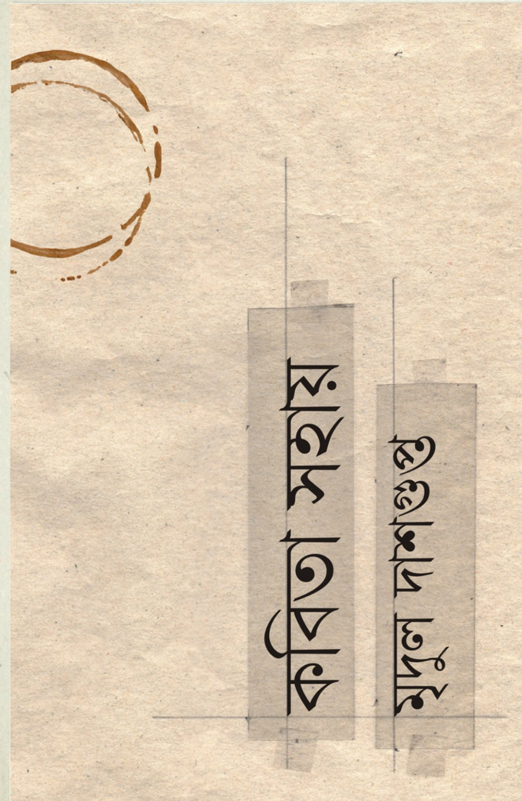
এদিকে ১৯৬৪-তে শুরু হল আন্দোলন। অর্থাৎ যাকে 'আন্দোলন' বলা যায়। তার সৃষ্টির সঙ্গে বাসুদেব ছাড়া আর কেউ যুক্ত রইল না। বিরাট প্রচার চলছিল। সকলেই দুমদাম বই বের করে ফেলে, কিন্তু আমার বই বেরোল অনেক পরে — টাকার অভাব আর আলস্যের কারণে।

এবার বইতে কী আছে এবং তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে দু-চার কথা বলা দরকার। কোনো কবির পক্ষেই তার বইতে কী আছে, তা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। হয়তো বলা সম্ভবই নয়। কারণ এসব কেন্দ্রবিহীন কবিতায় যা আছে আমি মনে করছি, পাঠক হয়তো খুঁজে পাচ্ছেন একেবারে অন্য জিনিস, অথবা কিছুই না। একটা সচেতন প্রক্রিয়া ছিল, যে-কোনোভাবেই হোক ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ভোকাবুলারি পালটাতে হবে। ফলে পাঠকের চিন্তাচেতনার সাথে বিরোধও বেধে যেতে পারে।

১৯৬৪-তে আমেরিকার *টাইম ম্যাগাজিন*-এর প্রতিনিধি লুই কার এলেন সাক্ষাৎকার ছবি-ছাপা তুলতে। সেই সাক্ষাৎকারে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার লেখার বিষয় কী? উত্তর ছিল : 'My theme is me'। নিজেকে নিজের বিষয় করে তোলাই ছিল আমার চেষ্টা। কারণ মানুষ তো জন্মায়, তার সঙ্গে এই বিশ্বজগতের প্রতিটি প্রাণী গাছলতা ফুলফল আকাশবাতাস পশুপাখি জলআগুন বিপ্লববিদ্রোহ আত্মবিকাশ এবং আত্মহত্যা — এরকম সব কিছুর সম্পর্ক কী, সেটা জেনে নেবার জন্য। আমার মনে হয়েছিল, আমারও এই কাজ। তার জন্য যে মূল্যই দিতে হোক, আমি প্রস্তুত। ওই উক্তিটা শুধু বাংলাতেই নয়, বিদেশেও অনেকের কাছে খুব মূল্যবান বলে মনে হয়েছে — এরকম জানানো হয়েছে আমাকে। মনে হয় *জন্মনিয়ন্ত্রণ*-এ নিজেকে ব্যবহার করতে গিয়েই তার ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ভোকাবুলারি পালটে যায়।

‘বোধশব্দ’-র নতুন বইপত্র





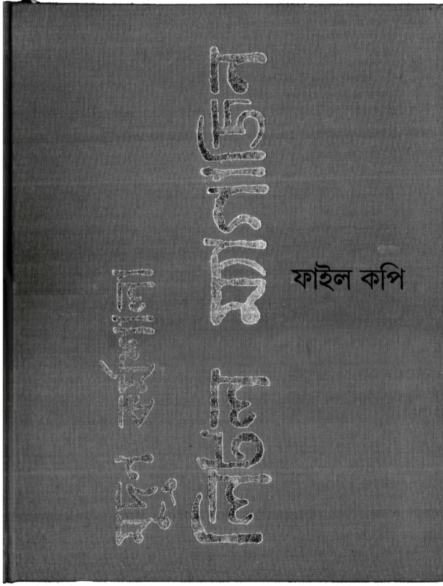
কলেজ স্ট্রিটে
ধ্যানবিন্দু
সুপ্রকাশ বইঘর
খোয়াবনামা বইঘর

বাংলাদেশে
বাতিঘর

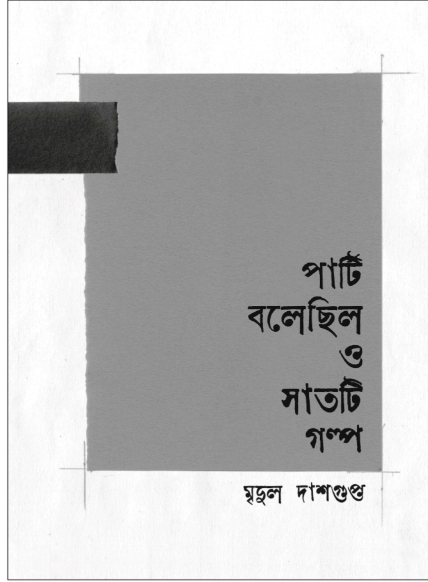
অনলাইনে
haritbooks.com
boighar.in
thinkerslane.com



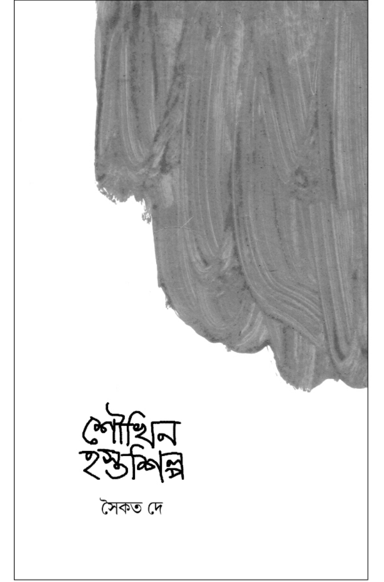
একটি বো ধ শ ব্দ প্রকাশনা



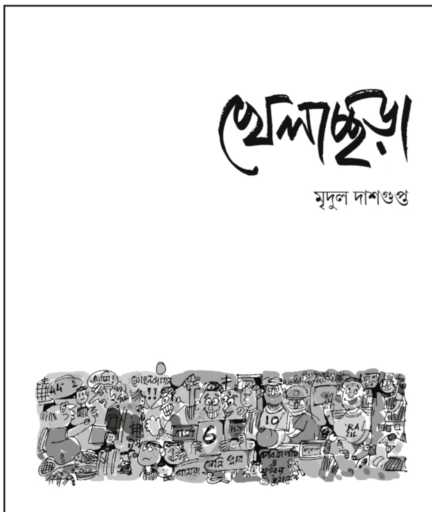
মুদ্রণ কর্মশালা : লিটল ম্যাগাজিন
ফাইল কপি
সুস্নাত চৌধুরী সম্পাদিত



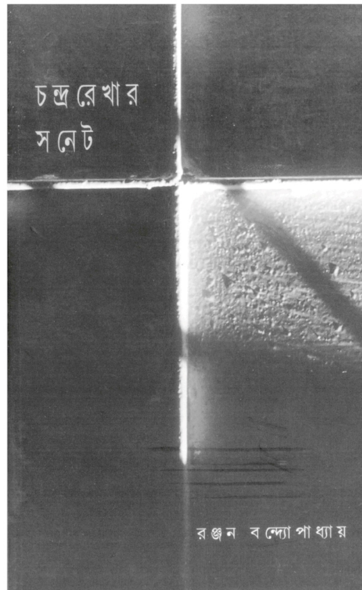
পার্টি বলেছিল ও সাতটি গল্প
মৃদুল দাশগুপ্ত
প্রচ্ছদ শৈবাল মুখোপাধ্যায়



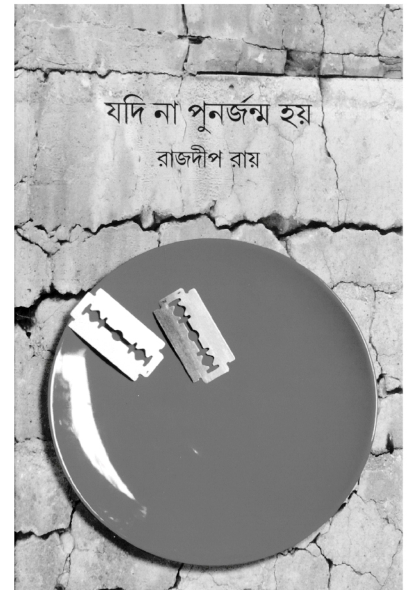
শৌখিন হস্তশিল্প
সৈকত দে
প্রচ্ছদ সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্যালিগ্রাফি কৃষ্ণেন্দু চাকী



খেলাচ্ছড়া
মৃদুল দাশগুপ্ত
ছবি চিরঞ্জিৎ সামন্ত



চন্দ্ররেখার সনেট
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ কৌশিক মুখোপাধ্যায়



যদি না পুনর্জন্ম হয়
রাজদীপ রায়
প্রচ্ছদ অতীন ভট্টাচার্য ও সুস্নাত চৌধুরী

বিচিত্র সব ঘটনা ঘটে যায়। *পাতিরাম* থেকে মাত্র তিন কপি বিক্রি হয়। বাকিগুলি ওরা ভয়ে লুকিয়ে ফেলে। কিছু লোক ভয় দেখায় ওদের। কিছু কপি কয়েকজনের হাতে তুলে দিই। দু-জন হাতে নিতে অস্বীকার করে। বাকি কপির বেশিরভাগ উই-এ খায় এবং পুড়িয়ে দিই। একখানা নিজের কাছে রেখেছি। দু-একজন জেরক্স করে নিয়ে যায়।

এক বন্ধু বইটির একটি আলোচনা লেখে, কিন্তু ছাপার জন্য সেই কাগজ প্রেসে গেলে লেখাটি হারিয়ে যায়।

বহু স্মৃতি ভিড় করে আসছে। সম্পাদক মশায়ের কথা বোধহয় আর রাখতে পারি না। বেশি লিখলে নিজের হ্যাংলামি প্রকাশ হয়ে যায়। তবু একটা মজার ঘটনা না-বলে পারছি না। *ঘোড়ার সংগে ভৌতিক কথাবার্তা* কবিতায় একটা লাইন ছিল এরকম : 'তেত্রিশ বালিকার বুকে তৃণগুল্ম খেয়ে কবিতা ফলন হয়'। কেউ একজন দুষ্টুমি করে ওই লাইনটির নীচে লাল দাগ দিয়ে আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দেয়। উনি বয়স্ক প্রাচীনপন্থী মানুষ। বিচারের জন্য ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি, প্রবীণ শিক্ষকদের অনেকেই আছেন। জানতাম তাঁদের অনেকেই আমার কথাবার্তার জন্য খুবই অপছন্দ করতেন আমাকে। এমনকী দশম শ্রেণিতে পড়াবার সময় স্পাই হিসাবে দু-একজন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ছাত্রদের ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল না অবশ্যই। বুঝুক না বুঝুক, ওরা চিরকাল নতুনের সাথী। 'তৃণগুল্ম খাওয়া' বিশেষ করে 'বালিকার বুকে' — এটার মানে জানতে চাইলেন। একটুখানি ঘাবড়ে যে যাইনি, তা নয়। চাকরিটা কি তবে আজই শেষ! মনে হল — আমি শুধু শিক্ষক নই, একজন কবি। মনে হওয়া মাত্র বুদ্ধিটা খুলে গেল। বললাম, স্যার গোটা ব্যাপারটাই একটা পবিত্র ব্যাপার। এটা হল সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা। ওঁরা বললেন, কিন্তু 'বালিকা' কেন? বললাম, আকাশের সৌন্দর্য, নদীর সৌন্দর্য, এমনকী সুন্দরী নারীর সৌন্দর্যের প্রশংসা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ করেছেন। আমি অন্যরকম করতে গিয়ে 'বালিকা' শব্দটা এসে গেছে। ওঁদের মুখ দেখে মনে হল এর উত্তর ওঁরা আর দিতে পারবেন না। বাইরে আমার দুই বন্ধু উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তিনজনে চায়ের দোকানে গিয়ে প্রচুর হেসে নিয়েছিলাম সেদিন।

ফার্নেসের পলতে, জ্বলেছিল কি?

কমল চক্রবর্তী

সম্ভবত প্রকাশক, বারীন ঘোষাল। ১৯৭১, জুলাই আগস্ট নাগাদ। একটা মেঘ, মেঘলা মনে পড়ে। 'অমি প্রেস', মুদ্রক পৃথ্বীশ সাহা। প্রচ্ছদ কমল সাহা। উৎসর্গ, মা।

১৯৬৮, শেষদিকে কবিতা লেখা, হ্যাঁ। তাও জামশেদপুরে। কোনো লিঃ ম্যাগাজিন নেই। ব্যক্তিগত, কোনো ম্যাগাজিনের নাম, জানি না। বাংলা অনার্স পাঠরতা এক দিদির কাছে, 'জীবনানন্দ' ইত্যাদি। খুবই ভেক। তৎকালীন, সাপ্তাহিক 'ছুটি', মাঝেমধ্যে। হ্যাঁ, বারীন ঘোষালের সঙ্গে।

১৯৬৯, মে, কারখানায়। ব্যস। কবিতা শুরু। প্রায় দেড় বছর পর গ্রন্থে। লজ্জাই। এখন ভাবলে পাঁজরা অবধি, বিদ্রোহ। ছিঃ! দেড় বছর পর, বড়োজোর পনেরো-কুড়িটি ছাপা পদ্য সম্বল! আচ্ছা তিরিশ-চল্লিশও যদি, তাতেই গ্রন্থ। বাবা, কবিতার সাক্ষাৎ যম, তাঁকে ভুজুং — দু-শো দিলে, কড়ার চারশো ফেরত! হ্যাঁ, ফাঁদে পা দিলেন। কোনোদিনও আমার কবিতা পড়েছেন, এরকম অপবাদ বা দুঃসংবাদ শোনা যায়নি। বাকি টাকা, এদিক-ওদিক থেকে। হ্যাঁ। উড়িষ্যা অ্যান্টিকে ছাপা। পাতলা বই মোটা, দৃশ্যত। মাত্র আটচল্লিশ পৃঃ। ওয়ান এইটথ ডিমাই, তিন ফর্মা।

বাবা টাকা ফেরত পাননি। র‍্যাদার, চাননি। পরে খানিক ছাপা অক্ষরেই, ওঃ!

না, আমার কোনো প্রেমিকা ছিল না। কাব্যগ্রন্থে, কোনো নারীর কোমল স্তনের পরিভাষা লাগেনি।

'অমি প্রেস' থেকে বেরিয়ে, মানে পটলডাঙা থেকে কলেজ স্ট্রিট, সুবিমল মিশ্র, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, তুষার চৌধুরীদের সঙ্গে! সৌজন্য, কমল সাহা। কারণ প্রথম গ্রন্থেই, 'গৃহ'। কমল সাহার বাড়ি নেতাজি নগরে। থাকা খাওয়া ফ্রি।

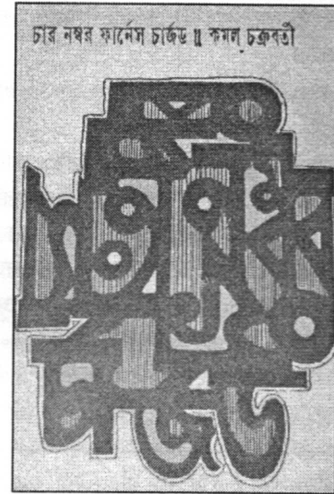
মুক্তমেলায়, *টাটাবাবা* কবিতা পড়ার সুবাদে, *রাঙামাটি* পত্রিকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ সাহার সঙ্গে ময়দানে। এবং তিনি মুগ্ধবোধ বোঝাতে বাড়ি অবধি, গান্ধি কলোনি। এবং *টাটাবাবা* কবিতাটা ওই পত্রে প্রথম এবং ওই ঝাড়খণ্ডি বাংলায়, ১৯৬৯। তখনও কোনো আধুনিক কবিতা আমরা দেখিনি। হ্যাঁ। আর *পরমা*-র মণীন্দ্র গুপ্ত, ওইসঙ্গে।

বলছি, *চারনম্বর ফার্নেস চার্জড*, নাম নিয়ে খুব বিতর্ক। অর্থাৎ অপছন্দ। এত ইংরেজি! শুধু 'চার' বাংলা। আসলে আমার কাব্যগ্রন্থ, ফার্নেস, আগুন দেওয়াই ব্যাপার। তবে তো রেড হেমাটাইট থেকে লোহা। হ্যাঁ, এরকমই।

যদিও সে আমলে হার্ড কভারের আলগা মলাট বড়ো একটা থাকত না। তবু খুব ক্যাটক্যাটে, কুৎসিত রং হওয়ায়, বাড়তি মলাট ওপরে চাপানো, সৌজন্য কমল সাহা।

বই-ছাপা চলছে, কফি হাউস যাতায়াত, চিনছি। খালাসিটোলা। জামশেদপুরে, স্বদেশ সেন, বারীন ঘোষাল কারও বই নেই। দু-একটা কাব্যগ্রন্থ, দু-এক শব্দ-শ্রমিকের, খুবই অনুচ্চারিত, নুব্জ্য বাক্যবন্ধ, অবশ্যই প্রতি-আধুনিক। কেন যে মন, আত্মা, শরীর জুড়ে, হঠাৎ-কবির দ্যোতনা! কাব্যগ্রন্থ, চাই। কী উন্মাদনা! গ্রন্থ আঁকড়ে, নিবেদিত পরিকাঠামো।

প্রথম কবিতা, ঝাড়খণ্ডি বাংলায় — *তুমার ডেরায় টাটাবাবা*। শেষ কবিতা, *শমীবৃক্ষ* — বাঙ্গাল ভাষার, মিশ্রণে নির্মাণ। মাঝে-মধ্যে ব্যাপক, কারখানার শব্দ, লোহালক্কড়, নাটবোল্ট, চিমনি, ধোঁয়া, জামশেদপুর, আদিবাসীভূম, সিংভূম অরণ্য। এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ।



আমি সমাজসচেতন নই। আমার বাপ-ঠাকুর্দা কেউ পথ অবরোধ মিছিল বা সাহেববধ পালায়, নেই। একদম তৃতীয় শ্রেণির কেরানি-বৃত্ত। তবু, প্রথম কাব্যগ্রন্থ, আদিবাসী, ঝাড়খণ্ডি সুখ-দুঃখ, কারখানা, জনপদ, বাংলাদেশ যুদ্ধ এবং নকশাল। খুচরো প্রেম ও ইচ্ছেকৃত যৌনতা (চমক সৃষ্টি কল্পে), হ্যাঁ। কারণ আমাদের ছোটো, আট-দশ লক্ষের শহর, এক শ্বাসে এপার-ওপার করা যায়, সেখানে যথেচ্ছ যোনি, লিঙ্গ, সঙ্গম, রোঁম, বানচোদ, নিতম্ব, স্তন, মাই, ব্যবহার! এবং মঞ্চে, মদে, মস্তিতে একাকার। ভীষণ কঠিন ছিলই। বা সামাজিক অবস্থানে, অসম্ভব, হ্যাঁ। অসামাজিক,

লুম্পেনও।

গ্রন্থ, যদিচ্ছ বিক্রি করেছি। মূল্য : দুই টাকা। মনে আছে, এক শ্রমিক বন্ধু দু-টাকা দিয়ে নিয়েছিল। কয়েক মাস পরে, তেল-কালি অবস্থায় মেশিনের পাশে। আনন্দের সঙ্গে সে আমলে লজ্জাও! কেন যে মরতে ওই শব্দ! খুব বদনাম হল, খুব প্রশংসা। সত্য গুহ, *গল্পকবিতা* (সম্পাদক : কৃষ্ণগোপাল মল্লিক) পত্রিকায় বেশ কয়েক পাতার প্রবন্ধ লেখেন। বিশেষ করে, *টাটাবাবা*, কবিতাটি দ্রুত ছড়ায়। 'টাটাবাবা আগুন দিলে / লোহা লিলে / দুখার মায়ের বুকের থ্যাইকে মহুয়াগাছের ছায়া লিলে কেনে...' ইত্যাদি। 'টাটাবাবা' কয়েনেজটি জনশ্রুতিতে পরিণত হতে থাকে। আমার ভালো লেগেছিল। কবিতা, আমাকে আরও বড়ো যুদ্ধে, আরও শ্রমে ঘামে, দীর্ঘ ক্ষয়ে। হায় জীবনে! অনেকেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ অস্বীকার করেন, ভুলে যেতে চান। আমাকে পাঠক ভুলতে দেননি। কতবার যে যাদবপুরের এক অধ্যাপক, অন্য বন্ধুদেরও মধ্যস্থতায় চেয়েছেন। এছাড়া আরও কিছু পাঠক, দিতে পারিনি।

আজ মনে হয়, প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'একখানা' ছিল। অত দীর্ঘ, খটমট সর্বগ্রাসী ইংরেজি নাম। পরে শোধবোধ, *জল, স্বপ্ন, মিথ্যেকথা, সরলরেখা, জিতেন্দ্র*, আমার কাব্যগ্রন্থ। হ্যাঁ, অবুঝ পাগল, ফার্নেস পলতেয়, দিয়াশলাই। জ্বালতে পেরেছিল কি? তবে সেদিন মুসকো, মুখময় ঘন দাড়ি, চ্যাটাল ছাতি, কবিকে(!) পবিত্র মুখোপাধ্যায়, ঘরে ডেকে দ্বিপ্রাহরিক অন্ন। এবং যখন জানতে পারেন, আমি যাদবপুরে নবনগরে ফিরব। বলেন, তোমাকে 'খোচর' ভাববে। ওদিকে ভয়ঙ্কর গোলাগুলি। নবনগর, গান্ধি কলোনি, নেতাজি নগর। বৃষ্টি ছিপ-ছিপ, রাত দশটা অতিক্রান্ত, মুখে কেটি-র চুম্বন, প্যান্টে কাদা ছিটকে, হাঁটছি। পথের ডুম আঁধার, মুখে ঝাঁ টর্চ। গুলির আওয়াজ, ছুটন্ত মানুষের মরণপণ। ফের পরদিন, ফের পরদিন। থামিনি। রাত দশটা না বাজলে, 'অমৃতায়ণ' ভেঙে।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের একটা দিন ও তার অক্ষর! আমার প্রথম গ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণ, হয়নি। নীরবে, আলোহীন। সাইকেলের হ্যান্ডেলে, থলিতে, *চারনম্বর ফার্নেস চার্জড*, কাউকে দেব বলেই প্যাডেলে পা, উঁচু-নিচু রাস্তার টিলা-পথ, মনে হয় — এই তো সেদিন! অথচ চল্লিশ বছর ধরে, টাটাবাবা আগুন দিলে লোহা লিলে। পরিবেশ, সচেতন, এতটা! এতটাই! চল্লিশ বছর আগে! — মহুয়া গাছের ছায়া লিলে কেনে?

পাঁচশো বই ছাপা হলে বাঁধাই সমেত ৩৫০/-, ১৯৭১! এত কম খরচে! ভাবা যায়!

সেদিন বাবাকে যক দিয়ে, বই। একদিন ফেরত। বাবার নামে, *জিতেন্দ্র* কাব্যগ্রন্থও! কিন্তু আজ কবি হবার জন্য কাদের প্রতারিত করব! গত চল্লিশ বছর ধরে কি সেই 'প্রথম পাপ'-এর জের!! শব্দবোধে ক্রুশ, আর কতদিন বইব! ছিঃ! ফার্নেস থেকে বড্ড বেশি ছাই, সারা আকাশে! হ্যাঁ, আনন্দিত কবি, সেদিন ওই গ্রন্থ কাঁকালে, আরও উন্মার্গগামী! প্রেমিকা না থাকায়, বিশুদ্ধ দিশি মদে গ্রন্থটি পবিত্র হয়েছিল। কারণ সঙ্গম ছিল না কেবলই ফার্নেস!

সে হারিয়ে গিয়েছে

মৃদুল দাশগুপ্ত

কবিতা, কবিতাই লিখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছি আমি, নাছোড় চেষ্টা সেই পনেরো-ষোলো বছর বয়স থেকে। শুরুর সময়টা সেই ১৯৬৬-৬৭ সাল। ষাট দশকের সেই শেষ বছরগুলির সময় থেকে ডাক যোগাযোগে আর ট্রেন-বাস সফরে যাঁদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে উঠল আমার, তাঁরা সকলেই কবিতাপ্রয়াসী। শ্রীরামপুর শহরে অগ্রজ সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম মজুমদার, প্রণব বসুরায়, রমা ঘোষ, সুহাস মুখোপাধ্যায়, প্রয়াত মুকুল বসু — সকলেই কবিতা লেখেন, আমি ওই তরুণ দলের কিশোরসঙ্গী হয়ে গেলাম। আমার সমবয়সি কবিতাপ্রয়াসী পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, দেব গঙ্গোপাধ্যায়ও এ দলে ছিলেন। ওই সময় সোমনাথদারা যখন *শীর্ষবিন্দু* পত্রিকাটি বের করলেন, ওই পত্রে আমার প্রথম 'আধুনিক' (তখন এরকমই বলা হত) কবিতাটি প্রকাশিত হয়। তখন জেলা শহরগুলিতে কবিসম্মেলন হত। সেসব সম্মেলন বাংলা আকাদেমির এখনকার কবিতা-আসরের মতো দমবন্ধ ছিল না। তাছাড়া সময়; সময় তখন লাল টুকটুকে স্বপ্নে নাচছে। সে নাচনের স্পর্শ লেগে গেছে সেই সময়ের কবিদের রচনায়। ধূর্জটি চন্দ শ্রীরামপুরে কবি সম্মেলনে এসে আমার ডায়েরি থেকে কয়েকটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিয়ে গিয়ে ছাপিয়ে দিলেন তাঁর *এবং* পত্রিকায় সাতটি কবিতা। সোমনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'সাদা ঘোড়া ছুটে যায় কালো ছায়া ফেলে', 'আইসক্রিম কলের মধ্যে হৃদপিণ্ড ছিটকে ঢুকে গেছে', সমর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'নত মুখ বেণী লম্বিত দোলে খুকির খুশি' — এসব কবিতায় আমি সেসময় ছিলাম আলোড়িত। সত্তর দশকের গোড়ার দিকে হাংরি জেনারেশনের সুবিমল বসাকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। ওঁর গদ্য, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষের গদ্য আমাকে বেশ আকর্ষণ করে। *গল্প কবিতা, থুড়ি, অধুনা* থেকে প্রকাশিত হয়েছিল উদয়ন ঘোষের বই *অবনী বনাম শান্তনু* — সে গদ্যও আমাকে মাতিয়ে দেয়। প্রিতম মুখোপাধ্যায়, অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পও আমার দারুণ লাগতে থাকে।



সত্তর দশকের মাঝামাঝি, জরুরি অবস্থা তখন, *সংবর্ত* পত্রিকা বের করে শেওড়াফুলির শ্যাম ভাওয়াল আর শ্যামলেন্দু বিশ্বাস, আমার দুই বন্ধু — ওরা আমাকে গল্প লিখতে বলে। ১৯৭৬ সালের অক্টোবরে, ডিসেম্বরে আর ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি তিনটি গল্প লিখে ফেলি। প্রথম গল্পটি *যুগ্ম কার্যক্রম* বের হয় *সংবর্ত* পত্রিকায়, দ্বিতীয় গল্প *স্বাস্থ্যের পক্ষে* ক্ষতিকর কোথায় বের হয়েছিল মনে নেই। তৃতীয় গল্পটি, *জীবাশ্মের...* প্রকাশ করেছিল পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, তার *বেলাভূমি* পত্রিকায়।

তিনটি গল্পেই চরিত্র বলতে দু-টি — আমি আর পিপি। পিপি এক কল্পিত মেয়ে, বাস্তবের কেউ নয়। সে সময় 'পার্সোনাল প্রেফারেন্স' নামে একটি সিগারেট বাজারে এসেছিল। সস্তার ওই সিগারেটকে চালুভাবে ডাকা হত — পিপি। আমি ওই নাম দিয়ে দিয়েছিলাম।

খুব একটা পরিকল্পনা নিয়ে নয়। ১৯৭৭-এর মার্চে হাওয়াবাতাস যখন একটা ফুরফুরে হয়ে এল, মনে হল একটা পুস্তিকা করলে কেমন হয়! শ্যাম ভাওয়াল আর শ্যামলেন্দু বিশ্বাসের উৎসাহে বাইশ পৃষ্ঠার শীর্ণ গল্পগ্রন্থটি বের হয়ে গেল। গ্রন্থ নয়, পুস্তিকা। আমার প্রথম বই। বই-এর নাম *আমি আর পিপি*। প্রকাশক : শ্যামলেন্দু বিশ্বাস, সংবর্ত প্রকাশনী, জগদ্ধাত্রীপাড়া, সেওড়াফুলি। ছাপা

হয়েছিল শ্রীরামপুরের বেলা প্রেসে। প্রেসের মালিক ছিলেন আমাদের কিশোর বয়সের ছাত্র ফেডারেশন নেতা নরোত্তম সেন, এখন মস্ত বড়ো জ্যোতিষী। খুব যত্নে অতি সস্তায় সে বই, পুস্তিকা, ছেপে দিয়েছিলেন নরোত্তমদা। পুস্তিকাটির দাম ছিল এক টাকা। লিনোকাটে এ বই-এ প্রচ্ছদ আমিই করেছিলাম। বই-এ প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই। পুস্তিকাটি উৎসর্গ করেছিলাম আমার ছোটো ভাই তোতনকে। হাওড়ার *আঁতু* পত্রিকায় এই বইটির চমৎকার একটি রিভিউ লিখেছিল শৌনক লাহিড়ী।

আশি-দশকের মাঝামাঝি কেবল কবিতা লেখার চেষ্টা করে যাব — এই মনোবাঞ্ছায় আমার ওই গল্পগ্রন্থটি সম্পর্কে কেন জানি না সঙ্কোচ হতে থাকে। ক্রমে বইটিকে আমি গোপন করতে থাকি।

বইটি সম্পর্কে এখন আমার কোনো দুর্বলতা নেই। এই লেখা লিখতে গিয়ে মনে হল, সে হারিয়ে গিয়েছে।

পুনশ্চ : সাম্প্রতিক কয়েক বছরে আমি কয়েকটি গল্প লিখেছি। আটটি গল্প লিখতে পারলে একটি বই প্রকাশ করার কথা ভাবব। ছ-টি লিখেছি, প্রকাশিতও হয়েছে।

আমার অনেক অন্তের মধ্যে একটি

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

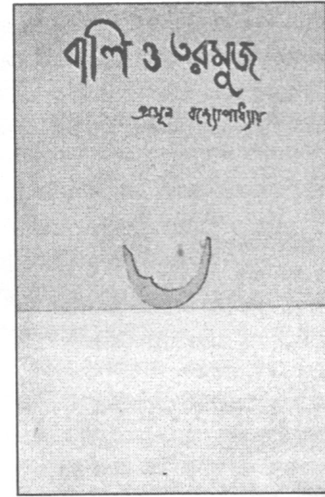
কবিতা ছাপা আমার প্রথম হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। পত্রিকার নাম ইত্যাদি ভুলে গিয়েছি। প্রায় সমবয়সি এক সাহসী সম্পাদকের ভয়ানক উৎসাহে একখানি ছোট্ট কবিতা গভীর কুণ্ঠার সঙ্গে তার হাতে তুলে দিয়ে মনে হয়েছিল, ভার্জিনিটি খোয়ালাম। আর আমার প্রথম কবিতার বই *বালি ও তরমুজ* প্রকাশিত হয় ১৯৮৩-তে, প্রথম কবিতা ছাপার ন-বছর পরে, যখন সেই কবিতাটিকে আমি অনেক খুঁজেছিলাম; পাইনি।

তবে তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে, মাঝের সময়টিতে আমাকে নিরন্তর লালন করে গেছে *অভিমান* পত্রিকা ও তার প্রাণপুরুষ কবি গৌতম চৌধুরীর বন্ধুত্ব। আমার মতো অনেককেই তিনি বাংলা কবিতার আঙিনায় পা রাখার সুযোগ করে দিয়েছেন ঠিকই, তবে আমার প্রতি বোধহয় কিছু বেশিই ছিল তাঁর শিক্ষকোচিত স্নেহ। এর পরে আরও একজন আমার কবিতা লেখা চালিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী বলে অভিযুক্ত হতে পারেন। তিনি হলেন পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল। আমার লেখালিখির প্রতি তাঁর অগাধ সহিষ্ণুতা আমাকে প্রচুর প্রশ্রয় দিয়েছে, কোনো সন্দেহ নেই। প্রশ্রয় দিয়েছে আমার লিখনশৈলীতে রণজিৎ দাশের ধারাবাহিক আগ্রহ। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ-দীর্ঘ সময় ধরে আড্ডা থেকেও আমি অজস্র পেয়েছি। এসব না পেলে আমাতে কে লিখত!

কে লিখত, আবাল্য প্রবুদ্ধ মিত্র বলে এক সৃজনশীল মানুষের বন্ধুতা না পেলে! বা, পরবর্তীতে, অমিতাভ মণ্ডল, অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র, একরাম আলি, মৃদুল দাশগুপ্ত, সোমক দাস, সূর্য ঘোষ, নির্মল হালদারের মতো সৃষ্টিপ্রাণ লোকজনের সশব্দ সাহচর্য না জুটলে! যিনি লিখতেন, লিখেছেন, লেখেন, তিনিই এতসব ব্যবস্থা করেছিলেন, নিশ্চয়। এখন আবছা টের পাই।

তা এইসব করতে-করতে ঢুকে পড়লাম আশির দশকে। হ্যাঁ, বাংলা কবিতার দশক-বুদ্ধি বেশ টনটনে। আমি সত্তরে গৃহীত হয়েছিলাম। অথচ তখনও কোনো বই নেই! আসলে ঐতিহাসিকতাকে খুব পাত্তা দেওয়ার মতো ধাতু আমার ছিল না। বর্তমানে বদ্ধ জীব আর কি যেমন হয়! লিখছি পড়ছি কলকলাচ্ছি, খোকনরা মিলে পত্রিকা করছি, আবার কী! বই-ফই করার সাতশো ঝকমারি। কিন্তু অতীতব্যাপার তো! ঐতিহাসিকতা মানেই 'ভূত'। মানুষ সুখে থাকলেই সে কিলোয়। সেই 'কিল' খেয়েই মানুষের মহার্ঘ ইনোসেন্স 'কিল্ড্' হয়। ফলে, আমারও একটা পাণ্ডুলিপি পয়দা হল।

অনির্বাণের সৌজন্যে তদ্দিনে ওদের আহিরীটোলার তরুণতর আরও একজনের সঙ্গে গভীর সখ্যে জড়িয়েছি। অনুরূপ ভৌমিক, যে 'ভিকটর' নামেই সবার কাছে বেশি চেনা। সাক্ষাৎভাবে কবিতালেখক হয়তো নয়, কিন্তু তা আমাদের কখনোই মনে হত না। আমাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিলেন আর একজন মানুষ, তপন মুখোপাধ্যায়। প্রথমে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল রণজিৎদার বন্ধু এবং তাঁর প্রথম বই *আমাদের লাজুক কবিতা*-র প্রকাশক হিসেবে। পরে অমিতাভর লেনিন সরণির বাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে তপনদার হাতিবাগান গ্রে স্ট্রিটের বাড়ির ছাদ ও চিলেকোঠাও হয়ে ওঠে আমাদের প্রধান আড্ডাস্থল। তপনদাই আমার প্রথম বইটা ছাপার টাকা জোগাড় করে দিয়েছিল। আর কাগজ-ছাপাই-বাঁধাই সবই করেছিল ভিকটর। সেই-ই *বালি* ও *তরমুজ*-এর প্রকাশক। শেষ পর্যন্ত, এই দু-জনের তৎপরতা ছাড়া বইটা দিনের আলো দেখত না। ঋণস্বীকার এদের কাছে আর কী করব! তো যাইহোক, তিরাশির বইমেলায় আমার কাঁধের ঝোলায় ঢুকে পড়ল আমার নিজের জ্যান্ত একটা বই! কিন্তু তা আমাকে ভারাক্রান্ত করেনি। কারণ এটা ছিল একটা সম্মিলিত কাব্যহুল্লোড়ের প্রযোজনা।



আর আজ প্রায় তিনদশক পার করেও যখন দেখি যে কবিতা আমাকে এখনও ছেড়ে যায়নি তখন বুঝি যে, সে হুল্লোড় নিরেট ফাঁকা ছিল না। এবং বেশ চাপ বোধ করি। একটা ডিজাইন যেন ছিল! হুল্লোড়ে ভুলিয়ে আমাকে এনে ফেলা হয়েছে এক নিবিড় শব্দারণ্যে। হয়তো তার মধ্যে দিয়েই পথ চলে গেছে অপৌরুষেয়তার দিকে! ডিজাইনের বাইরে!

হ্যাঁ, মন দিয়ে কিছু করার প্রশ্নে আমার কখনো কোনো অসুবিধে ছিল না। কিন্তু মন দিয়ে কিছু হওয়ার, কবি হওয়ারও, চেষ্টায়, আমার মধ্যে ঘটত তীব্র প্রতিক্রিয়া। করতে পারি দু-শো মজা, কিন্তু আমি তো আমিই! হব আবার কী! আমি-র চেয়ে বেশি আর আমি কীই বা হতে পারি! তাই করতে চেয়েছি নানান কিছু, কিন্তু হতে চেয়েছি শুধু 'আমি'। অন্যকিছু হওয়ার ডিজাইন আমার পোষায়নি ভাই। তাই আমাকে কবি 'হওয়ানো'-র ডিজাইনটা আঁচ করেও চাপ বোধ করি খুব, একদিকে। আর একদিকে, দেখি এটা একটা ছল। হওয়া-টওয়ার কিস্যু নেই। কবিতা লেখালিখি কর্মমাত্র। এই শব্দকর্মের মধ্যে দিয়েই আমার 'আমি' হওয়ার পথ গিয়েছে। আমাকে 'আমি' করার জন্যই যেন সব আয়োজন, যা আমি একমাত্র হতে চেয়েছি।

কবিতা লেখালিখি যদি কর্মমাত্র না হত, তাহলে তো *বালি* ও *তরমুজ*-এর কবিই হত আমার কাছে আমার আত্মপরিচয়! মনে রাখতে হবে যে, আত্মপরিচয়ই হল সেই পরিচয় যা দিয়ে একজন মানুষ নিজে নিজেকে চেনে। কর্ম ও আত্মপরিচয় দুটো আলাদা পদার্থ না হলে মানুষের যে কখনো-কখনো মনে হয়, ধরা যাক খুব রেগেমেগে চিৎকার করে উঠে মনে হয়, এ কী করছি, এ তো আমি নই — সেটা

কখনোই হত না। সুতরাং, কর্ম আত্মপরিচয়ের বাহ্য। আত্মপরিচয়ের মধ্যে পরোক্ষ কিছুই নেই। নইলে *বালি* ও *তরমুজ*-এর কবি *আনন্দভিখিরি*-র কবি হয় কী করে! আত্মত্ব ব্যতীত কোন পরোক্ষতায় অনুভূত হয় যে, দুটোই আমি! কোন পরিচয়েই বা ভোগ হয় কালান্তরিত কর্মের ফলাফল! এই যেমন আমাকে লিখতে হচ্ছে আমার প্রথম বই নিয়ে! এই যে দুটো আমি, বা অসংখ্য আমি-র আশ্রয় যে একটামাত্র আমি, সে একান্তভাবে *বালি* ও *তরমুজ*-এর কর্তা 'হয়' না। কোনোকিছুরই 'হয়' না। শুধু তার আশ্রয়ে একান্তিক কর্ম কৃত হয়। আমি অনেকান্তস্বভাব।

অনেকান্ত মানে মালটিটার্মিনাল। একেকটা টার্মিনালে যা ফুটে ওঠে, তা যেন বা স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র সৌন্দর্য, অসৌন্দর্য, অনির্বচনীয়তা। স্বতন্ত্র এইজন্যই যে, আমি তো কোনো টার্মিনালে, কোনো অন্তেই, শেষ নই! অনেকেই এর মধ্যে খোঁজেন 'বিকাশ'। আবার আর একদল দেখেন 'স্ববিরোধ'। আমি এরকম কিছু দেখতে পাই না বলেই এত ব্যাখ্যা করে কথাগুলো বলছি। *বালি ও তরমুজ*-এ এক উচ্ছ্বসিত প্রেমিক তার প্রেমিকাকে ঘোড়ায় চাপিয়ে পৌঁছতে চায় এমন এক বিবাহ-রেজিস্ট্রি অফিসে যেখানে যেতে হয় পাহাড়-অরণ্য ভেঙে। আবার সেজকাকা-কাকিমার মতো এক নিস্তরঙ্গ, দীর্ঘ, গেরস্ত, ছাতে-ওঠাতে-মাত্র সীমাবদ্ধ অন্তর্লীন প্রেমজীবনও তাকে টানে। সে একদিকে পাপ ও প্রিয়তার সমত্ব করে এই বলে যে, '...ঠিক পাপের মতো প্রিয়'। আবার 'বন্দুকের নল' নামক এক সোশিও-ঈশ্বরের কাছে তার চারপাশের জীবনযাপনের মধ্যে প্রচুর পাপ দেখে তা কনফেস করে এবং ইন্টারভেনশন চায়। পুনরায়, এক নন-সোশিও, নন-ইন্টারভেনশনিস্ট ঈশ্বরদর্শনও তার হয়। যেমন,

> একদিন আমাদের
> কথা বিনিময়ের সমুদ্র স্তব্ধ ক'রে
> জেগে ওঠে তার নীল ক্ষুব্ধ মাথাখানি
> হিমদৃষ্টি সহ এইদিকে, চুপ হই,
> আমাদের যা যা আছে সব তাকে প্রস্তাব করি
> যৌনচিত্র, ডিমভাজা, মদ, হাতঘড়ি
> সে কিছু বলে না, শুধু ভীষণ নির্নিমেষে চেয়ে থাকে
> তারপর ফের ডুবে যায়
> আমাদের যা যা ছিলো, সব আমাদেরই থেকে যায়
> যে রকম : কলহাস্য, হাহা...

বালি ও *তরমুজ* অন্তেও আমার এরকম নানান উপান্ত রয়েছে। কথার মধ্যে থেকে জেগে ওঠা কে এই শাসক অকথা? এই প্রশ্ন আমাকে সেই নির্দিষ্ট উপান্তেই টেনে নিয়ে যায়। দ্রষ্টার কাব্যনান্দনিক সংস্কারের সঙ্গে তার দৃশ্যবিশেষের বিচিত্র রসায়নে ফুটে ওঠা এইসব অন্তোপান্তগুলির কেউই কেবল সত্য নয়, মিথ্যাও নয়। আবার এইগুলির মোট যোগফলেও আমাকে যে পাওয়া যাবে, তা-ও নয়। কেবল আমার আশ্রয়েই এইগুলির কৃতি। এইভাবে, আমার সমস্ত বইপত্র ধরে, যা এখনও লিখিনি তাদেরও ধরে নিয়ে, আমার পুরো কবিত্বকে একলপ্তে আমি অনেকান্তে দেখি। এভাবেই শব্দকর্মের মধ্যে দিয়ে আমার 'আমি' হওয়া, যা বলছিলাম।

এখনকার আমার অন্ত থেকে দেখলে, বইটাতে মনে হয় খুব বেশি কথা বলা আছে। ক্রমাগত দৃশ্যবর্ণনার মধ্যে থেকেই কবিতাকে পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কখনো-কখনো বাহুল্য হয়ে যাচ্ছে। এখনকার আমি কাঁচি চালাত। হিংসার উপাচার যথা বন্দুকের নলকে সামাজিক সঙ্গতির ভগীরথ বলে পুজো করা হয়েছে। ধর্মীয় সংস্কৃতিকে 'বোকামি' বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এখনকার আমি, কী হিংসা কী অহিংসায়, কোনোপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে হস্তক্ষেপ বারণ করত ইত্যাদি। কিন্তু তাহলে তো এখনকার অন্ত থেকে বইটার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাহলে কী নিয়ে লিখছি, কেনই বা লিখছি! না, এরকম নয়। সম্বন্ধ আছে। এবং তা এক স্ববিরোধরূপ সম্বন্ধ নয় বা তা আমার কোনো কাল্পনিক একমাত্রিক বিকাশের পর্বমাত্রও নয়। *বালি ও তরমুজ*-এ যেটুকু কবিকৃতি আছে, কোনো একভাবে তার ফলাফল কালান্তরে আমি ভোগ করেছি। ভালো-মন্দ সবই। বাচ্চাছেলে উচ্ছ্বসিত কাঁচা লেখা লিখে ফেলেছি, বা জীবনবোধ পাকা হয়নি, ভুলভাল কথা বলে ফেলেছি — এমন ভাব আমার মধ্যে নেই। অনেকেই দেখি নিজের প্রথম বই লুকিয়ে ফেলতে পারলেই যেন বাঁচেন, যেপ্রকার কবিযশ তাঁরা ইচ্ছা করেন তার পক্ষে হানিকর হবে বলে। আমি তাঁদের দলে নই। আবার কেউ-কেউ দেখি সফল প্রথম বই-এর ভাবমূর্তিকেই যেন নিরন্তর রিপিটেশনের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছেন — তাদের দলেও নই। আমার কাছে, এসব লোকানোর জিনিসও নয়, নিজের মৃতদেহ নিজের কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতোও কিছু নয়। একেকটা অন্ত মাত্র। *বালি ও তরমুজ*, *উত্তর কোলকাতার কবিতা*। 'আমি' অনেকান্তস্বভাব।

'অবিদ্যা'-র দিন

সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

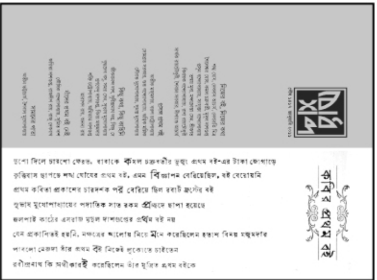
প্রথম বই মানে মাথার মধ্যে শব্দের গুন-গুন। আধো-ঘুম ভাঙা-স্বপ্নের রাত্তিরে একটা-দুটো লাইন। কফি হাউজের একটানা কথা-বলার ভোঁ-ভোঁ শব্দ। টেবিল ঘিরে উড়ে যায় সিগারেটের ধোঁয়া, ভাগ-করে-খাওয়া কফির গন্ধ। উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে, প্রথম বই মানে বড়ো প্রিয় সেইসব বন্ধুবান্ধবের মুখ।

একা থাকি। সকালে স্কুলের আগে সখের বাজার থেকে কিনে-আনা যৎসামান্য আনাজপাতি, হয়তো দুটো চারা মাছ। বছরখানেকের ঘরসংসার ভেঙে যাওয়ার পরেও খুব যে রান্নাবান্নায় দড়ো, তা নয়। ঝোলভাতে খাওয়া সেরে স্কুল। বিকেলে গা ধুতে যাওয়ার সময় স্টোভে বসিয়ে দেওয়াই যায় আলু-পটল যা থাকে — বাটিচচ্চড়ি। তারপর কলেজ স্ট্রিট কিংবা বেশির ভাগ সন্ধের লাইব্রেরি-মাঠ। গঙ্গার দিকে মুখ করে চওড়া সিঁড়ির উঁচুতে বসে থাকি, একজন দু-জন করে বন্ধুরা আসে। এর চেয়ে বড়ো হৃদিবিনিময় যে আর কীসে হয়, বুঝে উঠতে পারি না। ফেরার পথে লাইব্রেরির উলটোদিকে ভোম্বলদার দোকান থেকে দুটো রুটি কিনে বাড়ি ফিরি। তখন একা। তখন কান্না। তখন কান্নার বদলে শব্দ। সেইসব শব্দে ঝেঁপে-আসা কবিতা।

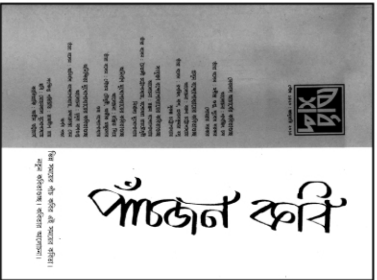


অবিদ্যা-র অনেক কবিতা — আজ আর বলতে লজ্জা করে না — আক্ষরিক অর্থে চোখের জলে ভেসে লেখা। *বিবাহঋতু* কপি করতে গিয়ে দেখি জায়গায়-জায়গায় ঝাপসা হয়ে গেছে। শুধু চোখের জল ভাবলে ভুল হবে। চোখের জলে কান্নাই হয়, কবিতা তো হয় না। আরো ছিল প্রশ্ন, ছিল রাগ, স্মৃতি ছিল বাঁকাচোরা

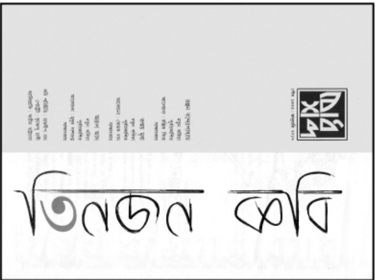




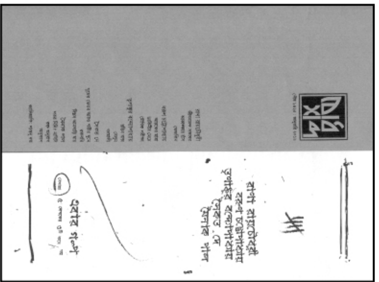
কবির প্রথম বই, জানুয়ারি ২০১১

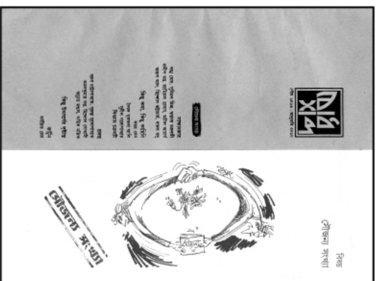


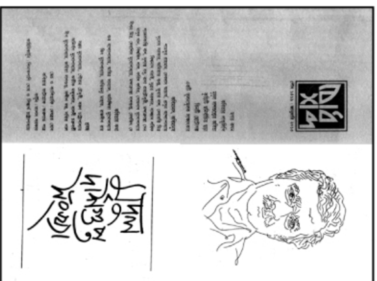
পাঁচজন কবি, জানুয়ারি ২০১৪

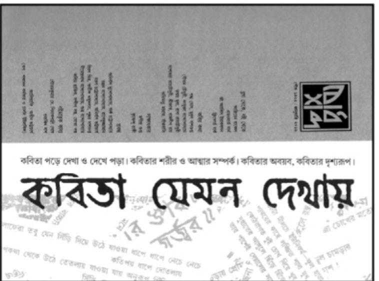


তিনজন কবি, জানুয়ারি ২০১৭

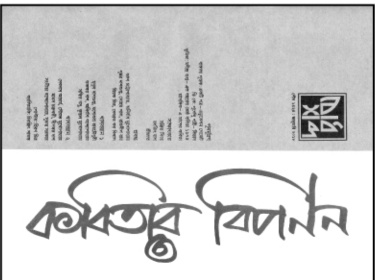

এবার গল্প, জানুয়ারি ২০১৯


সৌজন্য সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১০

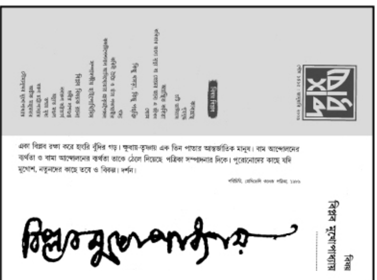

মৃদুল দাশগুপ্ত সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৩

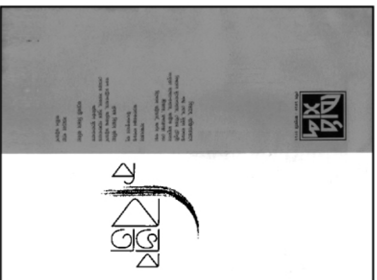


কবিতা যেমন দেখায়, জানুয়ারি ২০১৬



কবিতার বিপণন, জানুয়ারি ২০১৮


বিপ্লব মুখোপাধ্যায়, জানুয়ারি ২০০৯


বিভাব কবিতা, জানুয়ারি ২০১২



ভেটকি, জানুয়ারি ২০১৫

হয়ে — তার গায়ে পড়েছিল ঘটনা আর স্বপ্নের সাদাকালো ডোরা। সেই যে নদী পার হয়ে গিয়ে যে দেখিয়েছিল ফুটে-ওঠা জবা, আর আকন্দের আঠায় আঁকা হয়েছিল বিবাহপিঁড়ি, সেই যে বিউটিপার্লারে ছুঁচের ডগায় মৃত সিঁদুরের কণা উঠে এসেছিল, কালকাসুন্দের ঝোপে ফলিডলে নীল দেবীপ্রতিমাখানি আর সেই যে জবাকুসুমের মতো রাত্রি-রং পান করে চণ্ডী ঘুরছিলেন প্রান্তরের মধ্যে মত্ত — এসব ছবিরই অর্ধেক সত্যি আর অর্ধেক বৃষ্টি-পড়া রাতের দেয়ালা।

এ তো গেল কবিতার দিকটার কথা। আমার প্রথম বই *অবিদ্যা*-র তো একটা বাইরের চেহারাও আছে। সেদিকে তাকাতে গিয়ে একটা ভারী মজার সমাপতন চোখে পড়ল। যেমন বলেছি, *অবিদ্যা*-র লেখাগুলো মূলত তৈরি হয়েছিল উত্তরপাড়াতেই। তখন আমি বন্ধু অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাড়িতে ভাড়া থাকি। জীবনটা একভাবে ভেঙেচুরে যাচ্ছে। সেইসময় যা আমাকে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে দিয়েছিল, তা এইসব লেখা। নিজের সঙ্গে নিজের কথা-বলা। সেই সাদা শিমুলের তুলোর আঁশকে যেন আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। তারা ছড়িয়ে পড়ছে দিগ্বিদিকে। আর, সুস্নাত যে আজ আদেশ করল প্রথম বই নিয়ে লিখতে, তা-ও এই উত্তরপাড়া থেকেই অনেক-অনেকদিন পরে বেরোনো একটা কাগজের জন্যে। আর, গত চব্বিশ বছর ঢাকুরিয়াতে থাকার পর ঠিক তখনই আমি সপ্তাহে পাঁচদিনের জন্যে উত্তরপাড়ার বাসিন্দা।

বলছিলাম নিজের সঙ্গে নিজের কথা-বলার কথা। *অবিদ্যা* বেরোয় ১৯৮৫ সালের বইমেলায়। এই বইটার সঙ্গে যে-মানুষটির কথা অচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো, তিনি হলেন শ্রীপার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল। পার্থদা না থাকলে *অবিদ্যা*, *অবিদ্যা*-র মতো করে বেরোত কিনা সন্দেহ। অনুরাধা মহাপাত্রর সঙ্গে একটু-আধটু আলাপ ছিল। তিরাশির বইমেলায় লিটল ম্যাগাজিন চত্বরে অনুরাধাই পার্থদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। কিছুদিন পর থেকে একটু-একটু করে কফি হাউজের আড্ডায়। পার্থদাদের টেবিলে। উৎপলকুমার বসু, কালীকৃষ্ণ গুহ, রণজিৎ দাশ, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ মণ্ডল। একটা-একটা করে জলের ফোঁটার মতো লেখা হচ্ছে কবিতা, কেউ-কেউ চেয়ে নিচ্ছেন পত্রিকার জন্যে, ইচ্ছে হল বই করি। পার্থদাকে বলতেই উনি সোৎসাহে রাজি। শুধু আমার নয়, বহু তরুণ কবির বই তখন পার্থদার যত্নে ও পরিশ্রমে বেরোচ্ছে।

মনে আছে, স্ট্র্যান্ড রোড থেকে কাগজ কিনে সেই ভারী বোঝা বেলুড়ের বাড়িতে টেনে এনে পরের দিন আবার বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম কলেজ স্ট্রিটে। সেখান থেকে সুকিয়া স্ট্রিটে প্রেস অবধি বয়েছিলেন পার্থদা নিজে। কোনোটাই ট্যাক্সিতে নয় — এখন হলে যা করতাম।

একটা পর্ব ছিল নামকরণ। কত নামই ভাবি সবাই মিলে, কোনোটাই ধোপে টেঁকে না। শেষপর্যন্ত একদিন উৎপলকুমার বসু এসে 'অবিদ্যা' বলতেই, সবাই একবাক্যে মুগ্ধ। নামটির মধ্যে — এখনও মনে হয় — একাধিক স্তর থেকে গিয়েছিল। 'মায়া' থেকে বিবাহময় রক্ষিতাবৃত্তির অস্ত্রাঘাত পর্যন্ত।

অনেক ঘুরেছিলাম প্রচ্ছদের জন্যে। জয়া গাঙ্গুলির তখনও এত নাম হয়নি, একদম আমারই বয়সি, ভবানীপুরে থাকে। ওর প্রদর্শনীর রিভিউ পড়ে ললিতকলা আকাদেমি থেকে ঠিকানা যোগাড় করে খুঁজে-খুঁজে ওর বাড়ি। ও দিয়েওছিল ছবি। কিছুদিনের জন্যে একটা বন্ধুতাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেটা মূলত ছিল ছবি। প্রচ্ছদের জন্যে তো আঁকা নয়। ফলে নেওয়া গেল না।

শেষে উত্তরপাড়ার শিল্পী-বন্ধু দেবব্রত মল্লিককে বললাম। আমার ফরমাস ছিল সিঁদুরচুপড়ি, কড়ি ইত্যাদি বিয়ের মোটিফ দিয়ে লালপ্রধান প্রচ্ছদের। ও যা করে নিয়ে এল — পেটে তির-বেঁধা এক গর্ভিণী নারীর রেখাচিত্র — তাতে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। গভীর নীলঘেঁষা ছাইরঙের ওপর কালো রেখায় সেই ছবিওলা প্রচ্ছদ নিয়ে বেরোল *অবিদ্যা*। সামান্য এক ফর্মার বই।

সামান্য, তবু নিজগুণে অনেকে জানিয়েছিলেন ভালো-লাগার কথা। অনেক চিঠি পেয়েছিলাম। নিজের অগোছালো স্বভাবের দোষে সে-সব হারিয়েছি। তবু মনে পড়ে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ গুহ, সুব্রত সরকারদের চিঠির কথা।

আমার নিজের কাছে *অবিদ্যা* প্রিয় বই নয়। পারতপক্ষে ও-বই-এর পাতা খুলি না। ভয়ের হাওয়াও এক দেয়, খুব। কেন কে বলবে? ও-বই আমার পছন্দ না। তবু ওর মতো করে আর লিখব, সে সাধ্যও আমার নেই। কোনো লেখকেরই থাকে না। আমার এই তুচ্ছ জীবনে ওর গুরুত্ব অন্যরকম। সেই যে বলেছিলাম, আমাকে নিজস্ব মাটির ওপর দাঁড় করিয়েছিল *অবিদ্যা*। আপাদমস্তক আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভোগা একটি অল্পবয়েসি মেয়ে, যে জীবনের কটুতায় জর্জর, ভেঙে-যাওয়া — তার মুখ ঘুরিয়ে দিল আলোর দিকে। আর ছিল নতুন-নতুন বন্ধুবান্ধব।

ভুলতে পারি না, ১৯৮৫-র বইমেলায় একটু দেরি করে পৌঁছেছি, দূর থেকে হাত তুলে পার্থদা দেখালেন *অবিদ্যা*-র প্রথম কপিটি। মুহূর্তটা আজও অম্লান।

প্রথম বই-এর কথা

তন্ময় মৃধা

১৯৮২-৮৩ সালে আমরা যখন গোসাবার একটা ইস্কুলে পড়তাম তখন আমাদের হাতে এটা-সেটার মতো একটা *খেলার আসর* পত্রিকাও চলে এসেছিল একদিন। সেভেন-এইট হবে। আমি আর আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় সনাতন দুটো বিজ্ঞাপন নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম। মরিচ ঝাঁপির দলছুট, পরিবারছুট সনাতন আর গোসাবার ভূমিপুত্র আমি — সুবোধ ব্যানার্জির কাছে ইংরেজি পড়ি। আমরা ভালোরকম জানি যে ন্যাপকিন মানে গামছা। মুশকিল হল বিজ্ঞাপনের ছবিটা নিয়ে। আমরা দু-জনে কোনো এক নিভৃত বিকেলে বুঝতেই পারলাম না, ছবির এই ন্যাপকিন কী করে গামছা হয়। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, এ নিশ্চয়ই দামি কোনো গামছা। অন্য একটা বিজ্ঞাপনে সম্ভবত চিমা ওকেরি সবুজ মাঠে বসে কোক খাচ্ছিল। অনেক বিচার-বিবেচনা করে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম, চিমা ওকেরি যেটা পান করছে সেটা আসলে মদ। পঁচাশি সালে মাধ্যমিক দিই। ভর্তি হই স্কটিশচার্চ কলেজে। তখন জানলাম ন্যাপকিন আসলে কী, আর চিমা যেটা খাচ্ছিল সেটা একটা সফ্‌ট ড্রিংক।

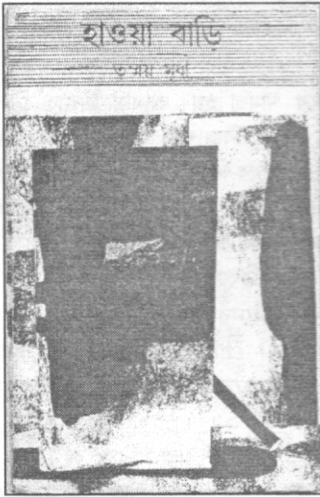
কলকাতা — যেখানে দিনের তখন দ্রুত চলার বয়স। সাতাশি সালে চলে আসি প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রেসিডেন্সি কলেজ — যেখানে যেকোনো বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্যে তৈরি হয়ে থাকে উপযুক্ত পরিবেশ। *হাওয়া বাড়ি*-র জন্ম সেই বীজতলা থেকে। ১৯৮৮-৯২-এ লেখা কবিতা নিয়েই বেরোয় আমার প্রথম কবিতার বই *হাওয়া বাড়ি*। উৎসর্গ বাবা-মা-কে, কপিরাইট ভাই ভাস্করের, প্রচ্ছদ অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, বড়ো ভালো-লাগা প্রচ্ছদ করেছিল অরিন্দম। বই-এর দাম বাইশ টাকা। প্রকাশক *প্রমা*। প্রকাশ বইমেলা ১৯৯৬।

এই বই-এর লেখাগুলো যখন লেখা হচ্ছিল তখন কেব্‌ল টিভি ছিল না, মোবাইল ছিল না, চিঠিই ছিল খবরাখবর আদানপ্রদানের একমাত্র মাধ্যম। কম্পিউটার ছিল না, সাইবার ক্যাফে ছিল না, ওয়েবসাইট ছিল না, ই-মেল-আইডি ছিল না, ফেসবুক তো ছিলই না। সত্যজিৎ রায় তখনও পুরোপুরি মহাপুরুষের স্বীকৃতি পাননি। আয়ান আলি বঙ্গাশ, আমান আলি বঙ্গাশ, সিডি প্লেয়ার কেউ ছিল না। তথ্যের অধিকার, নাসা, কিওটো প্রোটোকল কিচ্ছু ছিল না। কিন্তু হ্যাঁ, নকশাল বলে একটা গল্প ছিল। আর গল্প ছিল বলে আমরাও নিজেদের ওই গল্পের সঙ্গে থেকে-থেকে জড়িয়ে ফেলতে চাইতাম। তাই বলে মাওবাদী ছিল না, জ্ঞানেশ্বরী ছিল না, ছেঁড়া কাগজের মতো পথে-ঘাটে, ধান খেতে মানুষ মরে পড়ে থাকত না সেদিন। তখনও আমরা জানতাম না আমাদের শব্দ ভাণ্ডার একদিন সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে বারাক ওবামা, কন্ডোলিজা রাইস, কেমিক্যাল হাব, এনডিএ, ইউপিএ, ন্যূনতম অভিন্ন কর্মসূচি — এইসব কাব্যিক শব্দ আর শব্দবন্ধের ঝাপটায়।

সেই মর্মে মনে হয় *হাওয়া বাড়ি*-র কবিতাগুলো আসলে প্রাচীন প্রস্তর যুগে

লেখা। কুড়ি-বাইশ বছর আগে আমরা বেশ মজায় ছিলাম। একদম বুঝিনি এত দ্রুত বদলে যেতে পারে সময়। আমার আজ বস্তুতই মনে হচ্ছে, নব্বই-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কালকে সভ্যতার উষালগ্নের অন্তর্গত করে দেখাটাই ঠিক হবে। তাই বলে *হাওয়া বাড়ি*-কে আমি বলি না — তুমি উষার সোনার বিন্দু — অত প্রেম নেই আমার। শুধু ওই প্রস্তরীভূত সুর আর স্বরটুকুর জন্য মায়া রয়ে গেছে। ২০১০-এর জানুয়ারিতে চোদ্দো পেরিয়েছে *হাওয়া বাড়ি*। কোথায় কাদের বাড়ির বই-এর তাকে অন্তর্মুখী একটি কিশোরের মতো চুপটি করে আছে সে, আমি নিজেও জানি না। দৈবাৎ তার সঙ্গে দেখা হলে তার নরম চুলে হাত বুলিয়ে দিই আর ফিস-ফিস করে বলি — ভালো থেকো।

প্রথম প্রকাশ : স্থান — প্রেসিডেন্সি কলেজের কোয়াড্র্যাংগেল। কাল — সায়ং। (সদ্যপ্রয়াত) বন্ধু অচ্যুত মণ্ডলের মধ্যস্থতায় আমার বই করতে এসেছেন *বুলেটিন*-এর সম্পাদক (সদ্যপ্রয়াত) শৌভিক চক্রবর্তী এবং *এই সহস্রধারা*-র সম্পাদক শঙ্কর রায়। কোয়াড্র্যাংগেলের আধো আলো আধো অন্ধকারে শুরু হল অগ্নিপরীক্ষা। পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠ। মানের বিচারে উত্তীর্ণ হলেই বই বেরোবে। দু-চারটে কবিতা পড়ার পর-পরই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই ঘেঁটে দিতে শুরু করল অচ্যুত। এঃ-এঃ-ধ্যার-ধুর — এগুলো কী শোনাচ্ছো — এগুলো কী শোনাচ্ছো তন্ময়! আমি বিমূঢ়। এটাই তো আমার পাণ্ডুলিপি। ভালো করেই তো জানে অচ্যুত। তাহলে এমন করছে কেন? সম্ভাব্য প্রকাশক দু-জন হাসতে-হাসতে চলে গেল। আমার বই বেরোল না। ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিলাম শৌভিকের কাছে। গোটা বিষয়টার উপরে আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না বলে অনুশোচনা হয়েছিল।



দ্বিতীয় প্রকাশ : যাদবপুর এইট বি-র আশপাশের কোনো একটা ভাড়া বাড়ি। হিন্দু হোস্টেল ছেড়ে বাবলা (রজত রায়চৌধুরী) তখন ওখানে কাদের সঙ্গে যেন থাকতে শুরু করেছে। অচ্যুত আমার বই প্রকাশ নিয়ে ছেলেখেলা করেছে। ফলে ক্ষুব্ধ বাবলা স্বেচ্ছায় আমার বই প্রকাশের দায়িত্ব তুলে নিল কাঁধে। হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি নিয়ে হাজির হলাম একদিন। এখন সব স্মৃতির মতো আবছা লাগে। একতলার একটা ঘরের দরজার সামনে যথাসময়ে পৌঁছে গিয়ে কাউকে পাই না আমি। হতবাক হয়ে ফিরে আসি। ঠিক সেইদিন থেকে আমি 'বন্ধু' শব্দটির বাস্তবতা, তার সীমা ও সম্ভাব্যতা বিষয়ে সচেতন হই।

তৃতীয় প্রকাশ : ইতিমধ্যে সোনারপুরে চলে এসেছি। মনে হচ্ছিল, আমার বইটা হবে। কোনো না কোনো প্রকাশক বইটা করবেন নিশ্চয়ই। তখন আমি রবীন্দ্রভারতীতে পেন্টিং নিয়ে পড়ছি। *দেশ*-এ কবিতা বেরোচ্ছে। লাগাতার কবিতা বেরোচ্ছে অন্যান্য পত্রিকায়। কনফিডেন্ট ছিলাম — বই বেরোবেই। অচ্যুত নয়, বাবলা নয়, নতুন দালাল ধরলাম। আমার ভাই, আর ভাই-এর সঙ্গে পেয়ে গেলাম ভাই-এর বন্ধু রাজীব চৌধুরীকে। এরা সব যাদবপুরে বাংলা পড়ে। টার্গেট করলাম *প্রমা*-কে। সম্পাদক সুরজিৎ ঘোষ নবীন কবিদের কবিতার বই ছাপেন। ওখানেই যেতে হবে। টেকনিক নিলাম — কবি(?) যাবে না। পাণ্ডুলিপি নিয়ে যাবে কবির ভাই ভাস্কর এবং তার বন্ধু রাজীব। ক্লিক করে গেল। কবিতার জন্য কতটা জানি না, কিন্তু উনি এই সেন্টিমেন্টাল মুভটাকে বোধহয় ফেরাতে পারলেন না। রাজি হয়ে গেলেন। প্রকাশিত হল আমার প্রথম কবিতার বই *হাওয়া বাড়ি*। সমসাময়িক বন্ধুদের মধ্যে প্রথম বই, যেটা প্রকাশক তার নিজের খরচে বার করলেন। সেই বয়সে গর্বিত হবার মতো ঘটনা।

আমার যাতায়াত শুরু হল সুরজিৎ ঘোষের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে। আজব ওই বাড়ির আবহ। অদ্ভুত ওই সুরজিৎ ঘোষ মানুষটা। রাস্তার দিকের খোলা বারান্দায় বসে, হাঁটুর উপরে পায়জামা তুলে সুরজিৎদা *হাওয়া বাড়ি*-র প্রুফ দেখছেন। প্রচ্ছদ দিতে এসেছিলাম। দেখে বললেন — কে করেছে প্রচ্ছদ? এত টোন কেন? আমি মিন-মিন করে বললাম — মানে, এগুলো তো ছাপায় চলে আসে। হালকা বকার ভঙ্গিতে বললেন — হ্যাঁ, ছাপায় তো চলে আসবেই, কিন্তু যত গুড় তত মিষ্টি — তা কি বোঝ? চুপ করে থাকি। একদম শেষ লেখাটায় গিয়ে মারাত্মক একটা ভুল ধরে বসলেন —

কেউ এলে যত্ন-আত্তি —
কেউ গেলে — প্রত্যুদ্গমন

এই দ্বিতীয় পঙ্ক্তির 'গেলে' শব্দটা ভুল। ওঁর মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক (সমতুল)-এ প্রাপ্ত বাংলার নম্বরের খতিয়ান এবং তৎসহ আমাকে আমার বাংলা ভাষাজ্ঞানের নিরিখে পেড়ে ফেলতে পেরে স্বস্তি বোধ করছেন তখন। ভাবছেন, দেখি ছেলেটা কী করে বাঁচায় কবিতাটা। তর্ক না, বিতর্ক না, আমি সেকেন্ডের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিলাম —

কেউ এলে যত্ন-আত্তি —
কেউ এলে — প্রত্যুদ্গমন

ঝামেলাও চুকল, কবিতারও বিশেষ ক্ষতি হল না।

স্নেহ, প্রশ্রয় আর ভালোবাসা জাতীয় কিছু বস্তুর অস্তিত্ব টের পেতাম সুরজিৎদার কাছে। এই অকালমৃত সম্পাদক-প্রকাশকের জন্য কিছু কষ্ট রয়ে গেছে আমার। শুনছিলাম অসুস্থ তিনি। যাব-যাব করেও যাওয়া হয়নি তাঁর কাছে। খুব ক্ষীপ্র আর দুঁদে হলেই কোনো প্রকাশক কোনো নবীন, অনামা কবির প্রথম বই বার করবেন এমনটা না ভাবাই সমীচীন। খুব স্বাভাবিকভাবে তাঁকে কিছুটা মূর্খও হতে হবে। নইলে কবিদের প্রথম কবিতার বইগুলো কোনোদিনই যে পৃথিবীর আলো দেখবে না।

আমি নিজে যখন *হাওয়া বাড়ি* পড়ি, তখন সেই সময়কালটা ভেসে-ভেসে চলে আসতে চায় আমার খুব কাছে। সেই সময়টা মানে, কোনো শতাব্দী-টতাব্দি নয়, দিনদুনিয়ার বিচারে ওই মেরেকেটে দু-দশক আগের দিনগুলো। কোথায়, কখন লেখা, কোন পরিপ্রেক্ষিতে লেখা — সবই বেশ কাছে চলে আসে। কাছে এসে ফিরেও যায়। ফলত কেউ কারো মন বোঝে না। বলাবাহুল্য, *হাওয়া বাড়ি*-র বেশিরভাগ কবিতা হিন্দু হোস্টেলে লেখা, কিছু লেখা গরমের বা পুজোর ছুটিতে আমার গোসাবার বাড়িতে আর কিছু লেখা সোনারপুরে, সাহেব পাড়ার ভাড়া বাড়িতে। আমি ধরে নিচ্ছি আমার জীবনকাহিনি এবং আমার কবিতা রচনার মুহূর্তগুলো সহৃদয় পাঠক জানবার জন্য আদৌ আগ্রহী নন। আর হবেনই বা কী করে; আমি তো ওরহান পামুক নই। তাছাড়া একথা তো বনলতাও জানে যে কী সব বন্ধুকবিদের নামে-নামে ছেয়ে ছিল সেদিনের কবিতার আকাশ — ঋজুরেখ চক্রবর্তী, সুমিতাভ ঘোষাল, অভীক ভট্টাচার্য, অভীক মজুমদার, বিশ্বজিৎ পণ্ডা, প্রবীর দাশগুপ্ত, অচ্যুত মণ্ডল, জয়দেব বসু, অপূর্ব সাহা, আরও অনেক নাম। আর ওই কবিতাশিল্পের বিকাশে পশ্চাৎভূমি হিসেবে কাজ করছিলেন আরও কিছু কবিনাম। তালিকা দীর্ঘ হবে — এইসব বাদে কাজ করছিল অন্য একটা বিতর্ক।

প্রতিষ্ঠান নাকি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা। প্রতিষ্ঠান মানে আনন্দবাজার, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা মানে লিটল ম্যাগাজিন। তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোথায় তুমি লিখবে। প্রতিষ্ঠানে লিখলে অসুবিধে আছে — এরকম একটা বার্তা কিন্তু বাতাসে ছিল। আবার কোনটা যে প্রতিষ্ঠান আর কোনটা যে আভঁ-গার্দ — সে-ব্যাপারটাও খুব পরিষ্কার হচ্ছিল না। এককথায় বহুমুখী উত্তেজনায় প্ররোচিত হবার মতো হাজারো উপাদান ছিল সেদিন। আসলে তখনও ছিল অন্ধকার, তখনও ছিল বেলা। মানে, কবিতার জন্য তখনও কিছু সময় বরাদ্দ ছিল আমাদের সমাজে। এইসব হল গিয়ে আমার মনগড়া ধারণা, কেননা এগুলোই আমার মনে পড়ছে।

ইদানীং আমার মনে হচ্ছিল — কবিতার আয়ু ফুরিয়ে আসছে। কালক্রমে অনেক শিল্পের অবলুপ্তি ঘটে পৃথিবীতে। অজন্তা দ্বিতীয়বার হয়নি; মহাবলীপুরম, কোনারক দ্বিতীয়বার হয়নি। ভাবছিলাম কবিতার দিনও তাহলে শেষ হয়ে এল। ভ্রমণ আর মদ্যপান এখন বাঙালির প্রথম ও দ্বিতীয় পছন্দের তালিকায়। তৃতীয় পছন্দ অবশ্যই টেলিভিশন। কবিতা, ছবি এগুলোর র‍্যাঙ্কিং বোধহয়, অনেক নীচের সারিতে নেমে গেছে। তবুও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করছি এই অভূতপূর্ব দুঃসময়েও কবিতা লেখা হচ্ছে, প্রকাশিত হচ্ছে কবির প্রথম কবিতার বই। তবে হ্যাঁ, ২০১১-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর যদি দৈবাৎ বলে বসেন — কৃষিই আমাদের ভিত্তি এবং শিল্পই আমাদের ভবিষ্যৎ, তিনি যদি ক্লাব-থানা সমন্বয় কমিটির সহায়তায় বইমেলা, পুষ্পমেলা, শিশুমেলা করেন, যদি তিনি পাড়ায়-পাড়ায় প্রতি রবিবার রক্তদান উৎসব (শিবির নয়) করেন এবং তখনও যদি হাসপাতালে মানুষের বদলে কুকুর ঘুরে বেড়ায়, তাহলে অন্তত ভারতের এই অঙ্গরাজ্যটির সকল তরুণ কবির কাছে আমার আবেদন থাকবে — বেশ কিছু বছরের জন্য আপনারা আর আপনাদের প্রথম কবিতার বইটি বার করবেন না। বদলে বরং দ্বিতীয় বা তৃতীয় বইটাই বার করুন। কেননা অতি প্রকাশ্য সন্ত্রাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সত্য ও সুন্দরের বন্দনা ঠিক কীভাবে হবে, তা ভেবে দেখবার জন্য আমাদের কিছু অপেক্ষার প্রয়োজন হলেও হতে পারে।

কবিতার গল্প

মন্দাক্রান্তা সেন

চার বছর বয়েস থেকে আমার পদ্য লেখার শুরু। সেসব দেখে পাড়ার এক সাংবাদিক কাকু (তাঁরও পদ্যের বই ছিল) মন্তব্য করেছিলেন : এ তো ছড়া। কিন্তু তখন আমার লেখায় ছিল : গাছে-গাছে আজ কদমের কুঁড়ি কত যে দিয়েছে দেখা / প্রকৃতি নিয়েছে মায়াময় রূপ বৃষ্টির জালে মাখা। একে ঠিক ছড়া বলা যায় কি? আমার খুব অভিমান হয়েছিল। আমার মা কিন্তু বরাবর আমার লেখাকে কবিতাই বলেছে। দাদা আমাকে ছোট্ট একটা নোটবুক কিনে দিয়েছিল, মা তাতে সযত্নে আমার লেখা টুকে রাখত, আমি তো তখন মুখে-মুখে কবিতা বলতাম। বলতে গেলে সেটাই আমার প্রথম কবিতা-বই।

বড়ো হয়ে যখন স্কুলে পড়ি, আমাদের পাশের বাড়ির নিলমদিদি আমাকে ভারী সুন্দর একখানা ডাইরি দিয়েছিল। নিলমদি পাঞ্জাবি ছিল, বাংলা কবিতা বুঝত না। কিন্তু আমি লিখি বলেই আমাকে ডাইরিটা দিয়েছিল। ক্রমে সেই ডাইরিও ভরে গেল। স্কুলবেলা থেকেই আমি ছন্দের পাশাপাশি গদ্য-কবিতাও লিখছি। ওই সুন্দর ডাইরিটা বন্ধুদের ও বাংলা ডিপার্টমেন্টের প্রফেসরদের হাতে-হাতে ঘুরত। বিশেষ করে মহাশ্বেতাদি আমাকে গভীর উৎসাহ দিতেন, সেই স্নেহের কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। বন্ধুরা তো বলত, এটা মন্দাক্রান্তার প্রথম কবিতা-বই।

কিন্তু আমার সত্যিকারের প্রথম বই বুনে উঠেছিল জয় গোস্বামীর হাত ধরে। একদিন এক অগ্রজ বন্ধু, যাঁর সঙ্গে জয় গোস্বামীর আলাপ ছিল, তাঁর তাড়নায় প্রায় উত্যক্ত ও বাধ্য হয়ে কবিতার খাতা হাতে আমি জয় গোস্বামীর কাছে গেলাম। সেই নোটবইটা ছিল আমার প্রথম বিয়ের পর শ্বশুরমশায়ের দেওয়া। জয় গোস্বামী পাতার পর পাতা উলটে আমার পুরো নোটবই-এর সব কবিতা পড়লেন। আমি বিস্মিত ও লজ্জিত হয়ে হতবাক মাথা নিচু করে বসে থাকলাম। তারপর হঠাৎ জয় তাঁর ফর্সা তীক্ষ্ণ তর্জনী একটা কবিতার ওপর রেখে বললেন : আপনি কবিতার জন্য এসেছেন, আপনি কবিতাই লিখবেন। তখন আমার মনের কী অবস্থা বলে বোঝানোর নয়, ভেতরে-ভেতরে অসম্ভব কাঁপছিলাম যে, এ কথা মনে আছে।

তারপর *দেশ* পত্রিকায় আমার ছ-টা কবিতা একসঙ্গে গুচ্ছ কবিতারূপে বেরোল। তখন ১৯৯৮ সাল। জয়ই আমার কবিতা বেছে দিলেন। তারপর বললেন, তাদের একটা কমন শিরোনাম ঠিক করতে। আমি ঠিক করলাম : *হৃদয় অবাধ্য মেয়ে*। জয়ের সে নাম দারুণ পছন্দ হল। ওই নামেই *দেশ*-এ প্রকাশিত হল আমার কবিতাগুলি।

সে বছর জীবনানন্দ শতবর্ষ ছিল। *আনন্দ পাবলিশার্স* সে-কারণে অনেক কবিতার বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমি তো সে-কথা জানতাম না। জয় বললেন, আমার বই হবে। বিশ্বাস করতে পারিনি। তারপর *আনন্দ* থেকে অফিশিয়াল চিঠি এল, তখন আর বিশ্বাস না করে উপায় কী!

জয় আমাকে পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে বললেন। বললেন, অনেক-অনেক কবিতা টুকে আনতে, তিনি বেছে নেবেন। আমি আশি-পঁচাশিটা কবিতা নিয়ে গেলাম। সবগুলি পড়ে জয় বেছে দিলেন পাণ্ডুলিপিতে কোন-কোনগুলো যাবে। এবার আসল পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হবে। বললেন, তিনি নিজে আমার পাণ্ডুলিপি করবেন। নাম রাখা হবে : *হৃদয় অবাধ্য মেয়ে*।



আমি তখন কাবেরীদির সঙ্গে শান্তিনিকেতন চলে গেছি। একদিন বুথ থেকে একটু বেশি রাতে জয়কে ফোন করেছি। জয় বললেন : কী বলবে, তাড়াতাড়ি বলো। আমরা তোমার পাণ্ডুলিপি বানাচ্ছি। কবিতা কেটে-কেটে কাগজে সাঁটানো হচ্ছে, আমরা বিষম ব্যস্ত।

সে তো শুনলাম, গায়ে কাঁটা দিল, বুকে উথালপাথাল। কিন্তু প্রশ্ন হল 'আমরা' মানে কী? কারা? যা শুনলাম, তাতে আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। জয় গোস্বামী সেই রাতে শ্রীজাত, শিবাশিস মুখোপাধ্যায় ও পিনাকী ঠাকুরকে নিয়ে আমার পাণ্ডুলিপি বানাচ্ছেন। এঁরা প্রত্যেকেই আমার প্রিয় কবি ও প্রিয় বন্ধু। কিন্তু তাঁদের প্রতি এত কৃতজ্ঞতা আগে কখনো বোধ করিনি। বাকরুদ্ধ লাগছিল। চোখে জল আসছিল। সে জল তো ফোনে দেখা যায় না। হৃদয়ের প্রবল আলোড়ন বহুকষ্টে দমন করে, আমি কোনোক্রমে বলতে পেরেছিলাম : আপনাদের কী বলে ধন্যবাদ দেব, জানি না।

তারপর তো বই বেরোল, এবার প্রুফ দেখার পালা। তৃতীয় প্রুফের সময় আমার ভেতর থেকে কেমন একটা অনীহা এল। প্রুফ পড়ে রইল পড়ার টেবিলে, আমি তাকে ছুঁতেও পারতাম না। কেমন যেন মানসিক অবসাদ ঘিরে ধরেছিল আমায়। মনে হত, বইটা কেমন জ্যান্ত, ছুঁলেই আমায় ছোবল মারবে। আমি তাকে সহ্য করতে পারতাম না। যেন ওটা বাড়ি থেকে বিদায় হলে বাঁচি। কতদিন যে ওটা লেখার টেবিলে পড়েই ছিল খেয়াল রাখিনি। শেষে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে, স্বপনদা বাড়ি এসে প্রুফটা নিয়ে গেলেন।

বই বেরোল। প্রথমে শুনলাম, বইটা ১৯৯৯ সালের কৃত্তিবাস পুরস্কার পাবে। সেই শুনে আমার আবার মানসিক অবসাদ এল। দূর ছাই, এমন কী লিখেছি যে পুরস্কার পাব! যাই হোক, পরে শুনলাম পিনাকী ঠাকুর ও সুতপা সেনগুপ্ত পুরস্কারটা পাচ্ছেন। এঁদের কবিতা আমার ভালো লাগে। বিশেষত পিনাকী আমার প্রিয় বন্ধু, প্রিয় কবি। খবরটা পাওয়ার পর আমার মাথা থেকে একটা গুরুভার যেন নেমে গেল, বুক হালকা হয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারলাম, আনন্দে হাসতে পারলাম। তখনও তো জানি না এবার আমার কপালে কী কেস নাচছে!

প্রথমে কানাঘুষো খবরটা উড়ে এসেছিল। আমি সে-কথায় কানই দিইনি। জয়ও আমাকে একটা ছোট্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আমি বুঝিনি। তারপর *আনন্দ পাবলিশার্স* থেকে চিঠি এল, আমি সত্যিই সে-বছর আনন্দ পুরস্কার পেতে চলেছি। শুনে হেসেছি না কেঁদেছি মনে নেই। কেমন আচ্ছন্ন-আচ্ছন্ন লাগছিল। ঠিকমতো নাওয়া-খাওয়া করতাম না। আমাকে ঠিক করার জন্য মা-বাবা-দাদা আমায় কলকাতার বাইরে নিয়ে গেছিল।

আমি কাউকে বোঝাতে পারিনি এই উপলব্ধির কথা। কেমন যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। খবরের কাগজ আর টিভির সাক্ষাৎকারেও আমি একই কথা বলতাম। কেউ বুঝতে পারত না। বোধহয় বিশ্বাসও করত না।

পুরস্কার-অনুষ্ঠানে পুরস্কৃতের অভিভাষণে আমি বলেছিলাম : সমস্ত তরুণ কবির পক্ষ থেকে আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করছি। এ জয় তারুণ্যের জয়, সকল তরুণ কবির জয়। বলেছিলাম, আমাকে আজ অনুষ্ঠানের আলোকিত মঞ্চে যখন সম্মানিত করা হচ্ছে, তখন কোনো দূরে কোথাও, এই আলো থেকে দূরে, অন্তরালে, কোনো প্রতিভাবান কবি লিখে চলেছেন তাঁর অনবদ্য কবিতা। তাঁর পক্ষ থেকেও আমি আজ এই পুরস্কার গ্রহণ করলাম।

হৃদয় অবাধ্য মেয়ে আমার প্রথম বই। তার আগে মা আমায় বলত, আংটি বিক্রি করে আমায় বই করে দেবে। অথচ এবার বিনা খরচে আমার বই প্রকাশিত হল। সে আবার এক অন্যরকম বিস্ময়!

শ্রীজাত আমার বাড়িতে বইটা দিতে এসেছিল। আমার প্রাণের বন্ধুর হাত থেকে সেই প্রথম আমার বই স্পর্শ করা। সত্যি কথা বলব, প্রথমে ওই হলুদ প্রচ্ছদ আমার পছন্দ হয়নি। তার ওপর সাদা দিয়ে এলোমেলো গোল-গোল আঁচড়। পরে যখন আমার আরেক কবিবন্ধু সন্দীপন চক্রবর্তী বইটার রিভিউ করতে গিয়ে প্রচ্ছদ সম্বন্ধে উল্লেখ করে লিখল — এ যেন কবির মাথার কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ, তখন প্রচ্ছদটা আমার ভারী মনের মতন হয়ে উঠল।

আমার প্রথম বই-এর প্রথম আলোচনা করে আমার স্বামী অরিনিন্দম, তখনও ওর সঙ্গে আমার প্রেম হয়নি। আলোচনাটা ও প্রকাশ করেছিল ওর কবিতার কাগজ *বৃষ্টিদিন*-এ, আমাদের প্রেমের পর যা আমাদের দু-জনেরই কাগজ হয়ে উঠেছে।

বইটার বেশ কিছু কবিতা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সব চাইতে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল *একটি অসম পরকীয়া,* লোকে যার নাম দিয়েছিল 'ইন্দ্রকাকু'। তখনও পর্যন্ত আমি ডাক পেলে এখানে-ওখানে কবিতা পড়তে যেতাম, অনেকদিন হল যা আমি ছেড়ে দিয়েছি। তো, হল কী, যেখানেই যাই, শ্রোতা থেকে হোতা, সবাই অনুরোধ করে ওই কবিতাটা পড়তে, আর অনুরোধ শেষমেশ দাবিতে পৌঁছয়। আমার ভারী রাগ হত। আমি কি ওই একটাই কবিতা লিখেছি নাকি? আমি জেদ করে অন্য একটা কবিতা পড়ে সবাইকে রীতিমতো হতাশ করে মঞ্চ থেকে নেমে পড়তাম।

বইটির কবিতাকে কোনো একজন বিখ্যাত কবি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন গুড়ের মতো মধুর কবিতা, যা সমাজসচেতন নয়। আমি বলেছিলাম, আমি তো যা মনে আসে তাই লিখি, জোর করে এই বিষয় নিয়ে ওই বিষয় নিয়ে লিখতে হবে, তাতে আমি বিশ্বাস করি না। আমার কবিতা প্রেমময় সুন্দর এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখাতে চেষ্টা করে, যে সুন্দর পৃথিবী আমাদের সকল সংগ্রামের লক্ষ্য।

তারপর আমার কবিতাও বাঁক নিল। তখন আমার নিজেরই *হৃদয় অবাধ্য মেয়ে* থেকে কবিতা পড়তে ইচ্ছে করত না। তবু শ্রোতাদের অনুরোধে পড়তে হত। আমি তার সঙ্গে নিজেকে আর রিলেট করি না করি, শ্রোতা ও পাঠকরা তো করছেন — তাতেই যে আমি ধন্য!

এই হল আমার প্রথম কবিতা-বই-এর গল্প। এ গল্পের প্রধান ঋণ আমার প্রিয় কবি জয় গোস্বামীর কাছেই।

অন্য রঙের বয়েস

শ্রীজাত

— 'পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে পারবে একখানা?'

ক্লাস ইলেভন-এর ঝাপসা বিকেলগুলো খোলামকুচিতে ঠোক্কর মারতে-মারতে মনমরা হয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিতাম যখন, পিঠের ওপর নুয়ে পড়া স্কুলব্যাগটার ভেতরেই থাকত খাতাটা। কবিতার। আমার লেখা কবিতা। কবে শুরু করেছিলাম লেখা? নিজে-নিজে কিছু একটা লিখে ফেলার চেষ্টা, সে তো অনেকদিনের। কিন্তু রীতিমতো ডাইরিতে তারিখ দিয়ে গুছিয়ে লিখতে থাকার ব্যাপারটা বোধহয় ক্লাস সেভেন থেকেই। যদিও রোগটা দুরারোগ্য হয়ে উঠল ইলেভন-এ উঠেই। অনেকে এর জন্যে আমার বান্ধবীদের দায়ী করে থাকেন (আমি নতমুখে প্রায় মেনেও নিই সে-কথা, কারণ প্রেরণা হিসেবে একেবারেই তারা ছিল না, এ-কথা হলপ করে বলার সাহস আর হল কই), কিন্তু কেবল তাদের দোষ দিলে চলবে কেন? তাদের মধ্যে কেউ-কেউ আমার পাঠিকা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু স্কুলবাড়িটাও কম উৎসাহ দেয়নি। ওই এক ক্লাসে বছর ঘোরার আগেই কবিতা লেখার চেষ্টায় দু-তিনখানা ডাইরি ভরিয়ে ফেলেছিলাম আমি। রোজই, সারাদিন, স্কুলব্যাগের ভেতর ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকত একটা না একটা ডাইরি। অফ পিরিয়ড বা টিফিনে বেরোত অল্পস্বল্প, দু-একটা নরম হাতের পাতা হয়ে আবার মুখ লুকোত ব্যাগের ভেতর। এই ছিল আমার কবিজীবন। অনেক-অনেক ডাইরি ভর্তি করে কবিতা লিখে যাব, আর বন্ধুবান্ধবীদের পড়াব। এই ছিল আমার ভাবনার দৌড়। এর বেশি, কবিতার জন্যে বা কবিতার হয়ে আর কিছু করে ফেলবার কথা কখনো ভেবেও উঠতে পারিনি আমি। তাই জয়দা যখন রিসিভারের ওপার থেকে বলা নেই কওয়া নেই দুম করে এমন একখানা প্রশ্ন করে বসলেন, তখন আমি, আকাশ থেকে না হলেও, সাউথ সিটির ছাদ থেকে তো পড়েছিলাম বটেই (যদিও হাইরাইজ প্রজাতির এই শক্তিশালী নমুনাটি তখনও কলকাতায় ডেরা গাড়েনি)।

— 'পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে পারবে একখানা?'

— 'মানে, হঠাৎ...'

— 'করতে পারবে কি না বলো।'

— 'কবিতার?'

— 'আর কীসের? কবিতাই তো লেখ তুমি, নাকি?'

— 'আচ্ছা, মানে এটা কিসের জন্যে যদি...'

— '*প্রথম আলো* নামে পত্রিকাটায় লিখেছ তো তুমি। লেখনি? বীথি আর তরুণ, ওঁরা দু-জন মিলে করেন কাগজটা? এবার বইমেলায় ওঁরা ঠিক করেছেন,

তোমাদের মতো, এই নতুন যারা লিখছে, সেইরকম অনেকের বই বার করবে। এক ফর্মার বই, খুব বেশি লেখা তো লাগবে না। পারবে তো? আমি তাহলে হ্যাঁ বলে দিই ওঁদের?'

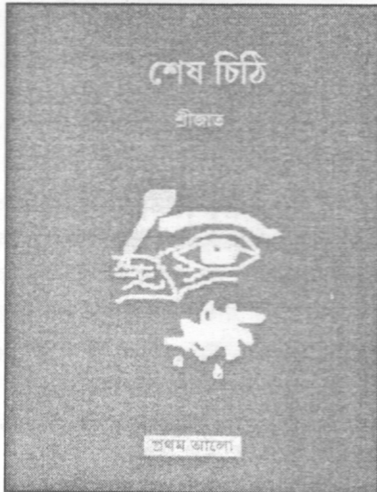
— 'ওঁরা নিজেরাই ছাপিয়ে দেবেন?'

— 'হ্যাঁ। তুমি শুধু পাণ্ডুলিপিটা করে দেবে।'

— 'কিন্তু এখনই কি আমার বই করে ফেলা উচিত একটা? এই তো সবে লিখছি।'

— 'তোমাদের নিয়ে এই হল সমস্যা, জানো তো? আমাদের কত কষ্ট করে প্রথম বই বার করতে হয়েছিল। কেউ নিজে থেকে চায়নি। আর তোমরা এত সুযোগ পেয়েও যদি না নাও, কিছু বলার নেই। ঠিক আছে, যা ভালো বোঝ, করো।'

একটা কলেজ থেকে ফেরা সন্ধেবেলাতেই এসেছিল বোধহয় আশ্চর্য এই ফোনটা। একটা গোটা কবিতার বই? আমার লেখা কবিতার? বার করবেন কেউ? বইমেলায় পাওয়া যাবে সেটা? মানে, আমার নাম লেখা থাকবে মলাটে? এইরকম আরও কত প্রশ্নে সে-রাতটা বাতিল হয়ে গেল। এদিক-ওদিক কিছু লেখা ছাপা হয়েছে বটে, কিন্তু বই হওয়া মানে আরও বড়ো বিপদ। একসঙ্গে সব লেখা পড়তে পাওয়া। জেনে-শুনে ব্যাপারটায় যাওয়া ঠিক হবে কি না, এ নিয়ে ভেবে চলে গেল আরও বেশ কিছু সন্ধে। তারপর গোছাতে বসলাম ছড়িয়ে থাকা লেখাগুলোকে। করেই ফেলি। কী আর হবে। বকাবকি করবেন হয়তো কেউ-কেউ, বন্ধুরা কি ঠাট্টা করবে? খুশিও তো হতে পারে। অত ভেবে লাভ নেই। দেখা যাক না করে, কী হয়।



একই সিরিজের বেশ কয়েকখানা লেখা জমেছিল তখন। সব ক-টা লেখাই, যদ্দূর মনে পড়ছে, আট বা দশ লাইনের। এক পাতায় দুটো করে ধরে যাবে। তৈরি হল আমার কবিতার প্রথম এক ফর্মা। কতবার যে পড়েছিলাম অপটু হাতের সেই পাণ্ডুলিপি, কত-কতবার যে ভেবেছি কবিতাগুলো বদলে দিলে ভালো হয়...

বীথিদি আর তরুণদা খুব যত্ন করে ছেপেছিলেন আমার বই। আমাদের অনেকের বই। একইরকম দেখতে হয়েছিল বইগুলো, বইমেলায়, কত সাল হবে সেটা, বোধহয় ১৯৯৯, একসঙ্গে *প্রথম আলো*-র স্টলে সাজানো থাকল বইগুলো। অনেক বন্ধুর বই বেরিয়েছিল সেই মেলায়, খুঁজে-খুঁজে নতুন লিখতে আসা কবিদের বার করেছিলেন বীথিদি আর তরুণদা।

তারপর তো পার হয়ে গেছে কতগুলো বছর। স্কুলব্যাগ ছেড়ে ঝোলা নিয়েছি, এখন আর তেমন কোনো মুখচোরা ডাইরি সঙ্গে নিয়ে ঘোরার ফুরসত পাই না। কিন্তু ছোট্ট সেই ষোলো পাতার ছেলেমানুষি বইটা হাতে নিলে এখনও টুপটাপ করে জ্বলে ওঠে সেইসব আশ্চর্য সন্ধেগুলো। মনে পড়ে একটা হঠাৎ-ফোন, কয়েকখানা ফুলস্কেপ পাতা, কিছু টুকরো কাগজ আর সাবধানী পায়ের ধুলো ওড়ানো একটা ঝিলমিল বইমেলা। মনে পড়ে একটা অন্য রঙের বয়েস, কোনও কবিতার বই-এর বিনিময়ে যা ফিরে পাওয়া যাবে না কোনওদিন।

বাকি কথা আজই হোক

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

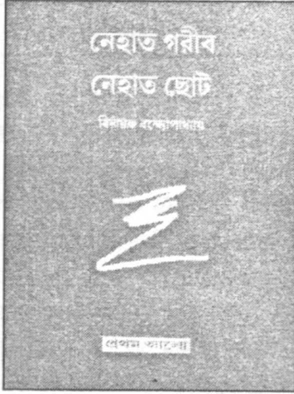
নেহাত গরিব নেহাত ছোট নামে আমার একটি এক ফর্মার বই প্রকাশিত হয়েছিল ২০০০ সালে। পরে সেই সময়ের অনেক অগ্রন্থিত লেখা জড়ো করে ওই বইটিই পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশ পায় ২০১০ সালে। তাই ইতিমধ্যেই পুনর্জন্ম ঘটে যাওয়া সেই বইটির কোন অবতারটিকে প্রথম ধরব সেই ব্যাপারে আমার মধ্যে একটু দ্বিধা আছে। সেই এক ফর্মার বইটি অবশ্যই প্রথম, কিন্তু সে তো হিমশৈলের চূড়া মাত্র। সমগ্র যে বইটির আমার প্রথম কেতাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ পাওয়ার কথা, প্রকাশ পেতে-পেতে এক যুগ লেগে গেল তার। ততদিনে হাফ ডজন কবিতার বই বেরিয়ে গেছে এই অধমের। তো, এসব ডিম আগে না মুরগি আগের কচকচানি বাদ দিয়ে মানুষ এবং দৈব সৃষ্ট সমস্ত দুর্বিপাক উচ্চশিরে গ্রহণ করে আমি বরং *নেহাত গরিব নেহাত ছোট*-র সমস্ত প্রহেলিকা থেকে একটু দূরে গিয়ে আমার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই *বাকি কথা পরে হবে*-কেই আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ হিসেবে ট্রিট দিই।

বইটা বেরিয়েছিল ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে, কিন্তু তার হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় শুরু হয়েছিল বেশ কিছুটা আগে। ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে অর্ণব অর্থাৎ কবি অর্ণব সাহা প্রথম আমাকে বলে, 'তোর একটা চার ফর্মার বই করা দরকার।' সেটা দুর্গাপুজো শুরু হওয়ার ঠিক আগে-আগে। বোধহয় চতুর্থীর দিন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো একটা সেমিনারে আমি আর অর্ণব দু-জনই ছিলাম। সেমিনার শেষে লবিতে আড্ডা দিতে-দিতে ওই প্রসঙ্গ। আমি সদ্য স্কুলে জয়েন করেছি, মাইনে চালু হয়নি তখনও। প্রথমে হেসেই উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু রাতে বাড়ি ফিরে ওই কথাটা ঘুর-ঘুর করতে লাগল মাথার ভিতর। নিজেকে নিজে বোঝালাম, মাইনে চালু হোক, তারপর।

মাইনে চালু হল, একদিন, সেইসময়ই শুরু হল আমাদের সম্পাদিত পত্রিকা *জরুরি অবস্থা*। শ্রীজাত, অনির্বাণ, অংশুমান, অর্ণব, রাজশ্রী, আমি — সবাই ছিলাম পত্রিকা শুরুর মুহূর্তে, সেইসময় থেকে প্রথমে শ্রীজাত, পরে অংশুমান খোঁচাতে শুরু করল আমায় — একটা 'চার ফর্মা' বের করার জন্য। অংশুমানের *নাটমন্দির*-এ আমাদের লেখালিখি শুরু। সেই *নাটমন্দির*-এর ব্যানারে আমার বই বেরোবে এমনটাই স্থির হল। অংশুমান নিজেই বলল আর আমি ঘাড় নাড়লাম। এবার ফোনে আমার কথা হয়ে গেল *নাটমন্দির*-এর আর-এক সম্পাদক আশিসদার (কবি আশিস গাঙ্গুলি) সঙ্গে। ঠিক হল, আশিসদার নামই যাবে আমার বই-এর প্রকাশক হিসেবে। কিন্তু বই প্রকাশ? তার কাজ তো আর আশিসদার পক্ষে পুরুলিয়া থেকে কিংবা অংশুমানের পক্ষে ঝাড়গ্রাম থেকে (অংশুমান তখন ঝাড়গ্রাম কলেজে পড়াত) এসে করা সম্ভব নয়। অতএব গরজে গয়লা পাথর বইতে শুরু করল।

শেয়ালদা থেকে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে কাগজ কেনার সেই অভিজ্ঞতা মনে থাকবে বহুদিন। ২১/৩ নাকি ১৮/৬, বল্লারপুর হোয়াইট নাকি অন্য কিছু, সেই নিয়ে বহু সময় কাটিয়ে শেষমেশ তরুণদার কথামতো কাগজ কেনা হল। এই তরুণদা হচ্ছেন তরুণ ধর, যার দমদমের প্রেসে ছাপা হয়েছিল *বাকি কথা পরে হবে*। তরুণদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আমার বন্ধু শুভঙ্কর, যার ভাবনা শ্রম এবং স্বপ্ন এই বইটার ডিটিপি করা থেকে শুরু করে বাঁধাই পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে

সক্রিয় ছিল। শুভঙ্করের দাদা শিল্পী ভাস্কর ভট্টাচার্য এঁকে দিয়েছিলেন বইটার প্রচ্ছদ। পারিশ্রমিক দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না এবং 'মেজদা' সেই প্রসঙ্গ তুলতে গেলেই সম্পর্ক-ছেদের ভয় দেখাতেন। কিন্তু যে যত্ন নিয়ে উনি প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন, যে ভালবাসায় প্রচ্ছদ আঁকার পরও প্রচ্ছদ পালটে আবার আঁকলেন, তার তুলনা পাওয়া মুশকিল।





মনে পড়ে বই বেরোবার পর শুভঙ্কর, তরুণদা আর মেজদার সেই উচ্ছ্বাস। আমি সেই মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলাম, 'ডেথ অব অথর' আসলে কী! আরও বুঝেছিলাম, যখন লিটল ম্যাগাজিন মেলায়, বইমেলায় রঞ্জনদা (কবি রঞ্জন আচার্য) *নাটমন্দির*-এর টেবিলে বসে আমার বই বিক্রি করাকে প্রায় ব্রত হিসেবে নিয়েছিল। এক ভদ্রলোক বই দেখে-টেখে চলে যাচ্ছিলেন — রঞ্জনদা তাঁকে প্রায় ধমকে বলল, 'কী হল, পঁচিশ টাকার বই কুড়ি টাকা করে দিচ্ছি তো, নিন!' — আমি লজ্জায় প্রায় টেবিলের নীচে ঢুকে যাই আর কি! তবে নিজে থেকেও বইটার খোঁজে এগিয়ে এসেছিলেন কেউ-কেউ। বিক্রিবাট্টা যা হয়েছিল, হয়েছিল — আমি যাকে পেয়েছিলাম, দিয়েছিলাম। সংকল্প ছিল বিলিয়ে এই পাঁচশো বই শেষ করতে হবে। (কাঁহাতক আর খাটের নীচে ডাঁই করে রাখা যায়!) এতে করে বই ফুরিয়ে গেছিল তাড়াতাড়িই, কিন্তু ওই বইটার জন্যে বছর দুয়েক পরে যখন 'কৃত্তিবাস' পেলাম, রঞ্জন প্রচুর বকাবকি করে বলল, 'আবার ছাপাও'। আবার ছাপাব? কোত্থেকে? এবার উদ্ধার করলেন, তরুণদা। বললেন, প্রায় শ-দুয়েক বই না-বাঁধাই-করা অবস্থায় ওঁর গুদামে আছে। খুব অল্প টাকায় (আমার ধারণা, লোকসানে) তরুণদা ছাপিয়ে দিলেন প্রায় দুশো বই। কৃত্তিবাসের তিলক কপালে লাগায় সেই বই বিক্রিও হল বেশ। আমি আর রঞ্জনদা একদিন দোসা খেয়ে সেলিব্রেট করলাম বইমেলা থেকে ফেরার পথে। সেই সম্বরের ঝাঁঝে, সেই চাটনির ঘনত্বে অনেকের ভালোবাসার স্পর্শ, গন্ধ টের পেয়েছিলাম আমার ওই সামান্য বই ঘিরে। আজও, চোখ বন্ধ করলে, পাই।

একটি গ্লানিময় রেখা

রাণা রায়চৌধুরী

আমার প্রথম বই *একটি অল্পবয়সী ঘুম*। বইটি করেছিল বন্ধু অমিতাভ ভট্টাচার্য। বইটি উৎসর্গ করেছিলাম মা, বাবা আর আমার ভাগ্নে মেঘমনকে। আমার বাবা তখন ছেলের কবি সাজার কায়দা দেখে একটু অবাক, একটু খুশি, একটু হতভম্বই হয়েছিলেন হয়তো!

প্রথম বই, দ্বিতীয় বই-এর কভার করেছিল দিব্যেন্দু বসু। রহড়ার ছেলে। এই অমিতাভ, দিব্যেন্দু এবং আমার প্রথম বই-এর প্রথম ক্রেতা পটাই-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল নীলাঞ্জন মুখো-র মাধ্যমে। আমি তখন প্রায়শই রহড়ায় যেতাম আড্ডা দিতে। আমি একটু বেশি বয়সে কবিতা লিখতে শুরু করি। পঁচিশ-আঠাশ বছর বয়েসে শুরু করে বত্রিশ বছরে গিয়ে, ১৯৯৬ সালে *একটি অল্পবয়সী ঘুম*। তবু তখন মন অনেক তরুণ ছিল। প্রেম ছিল এবং কামাতুর-বিষণ্ণতাও ছিল মনে। আর ছিল হঠাৎ অর্থকষ্ট। ওইসবই ছিল বইটাতে। আর যা ছিল তা হল মায়া, বিষাদ, মনখারাপ এবং প্রচণ্ড রাগ। এখন মন অনেক পালটে গেছে। রাগ নেই বললেই চলে। তবে প্রেম, বিষণ্ণতা, সেক্স এখনও প্রবলভাবে আছে। যখন যেমন মন, তারই ছায়া পড়েছে আমার কবিতায়।

একটি অল্পবয়সী ঘুম-এ আমার ছাব্বিশ থেকে ত্রিশ-বত্রিশের মনের ছায়া পড়েছে। তখন অনেক বেশি লিখতে পারতাম, এখন আর পারি না। তখন মন ছিল টান-টান ধনুকের জ্যা-এর মতো। যা দেখতাম, যা শুনতাম, তা-ই কবিতা হয়ে উঠত। এখন এই অক্টোবর-দশ-এ মন অনেক মরে এসেছে। এখন পাহাড়-সমুদ্র দেখার দিকে মন। তখন বৈরাগ্য ছিল। সেক্সের-প্রেমের বৈরাগ্য। গান-ভরা বৈরাগ্য ছিল তখন। ছিল ভরা-বিকেলের আনন্দময় বৈরাগ্য।

সাধারণত আমার পুরোনো লেখা, যা হয় ছাপা বা লিখিত হয়ে গেছে, তা আমি আর পড়ি না। কারণ, বিরক্তি আসে। মনে হয়, সবই ভুল লিখেছি। সবই অপাঠ্য মনে হয় আমার। প্রশ্ন হল, সবই অপাঠ্য মনে হয় যখন, তা হলে আর লিখি কেন? লিখি, তার কারণ লেখার সময় বা তার আগে লেখাটা যখন মাথায় ঘোরে, তখন খুব আনন্দ হয়। মনে হয়, আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতাটা লিখতে যাচ্ছি। লেখা হয়ে গেলে মনে হয়, অসাড় বস্তু প্রসব করলাম।

আজ অনেক বছর পর *একটি অল্পবয়সী ঘুম* পড়তে গিয়ে বেশিরভাগ কবিতাই পড়তে ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে, এখন লিখলে এভাবে লিখতাম না। এত বেশি কথাও হয়তো বলতাম না। আসলে তখন মনে হত, অনেক চমকদার কথা না বললে বুঝি কবিতাই হচ্ছে না। বলেই যাচ্ছি, বলেই যাচ্ছি — কবিতা যেন আর হয়ে উঠছে না, যেন পাঠককে আর চমকে দেওয়া যাচ্ছে না। এইসব মোহ-মুগ্ধতা (নিজের প্রতি) কাটিয়ে উঠেছি হয়তো এখন। এখন এত বেশি কথা লিখতে এবং পড়তেও আমার গা ঘিন-ঘিন করে।

তবু *একটি অল্পবয়সী ঘুম*-এ কিছু কবিতা আজও অন্তত আমার কাছে বেঁচে আছে। যেমন — *যাদবপুরের মোড়, বিকেল, ভাসান, দেবী, কালবৈশাখীর বিকেল, পঁচিশে বৈশাখ* — এরকম চার-পাঁচটি কবিতার প্রতি আমার এখনো দুর্বলতা আছে।

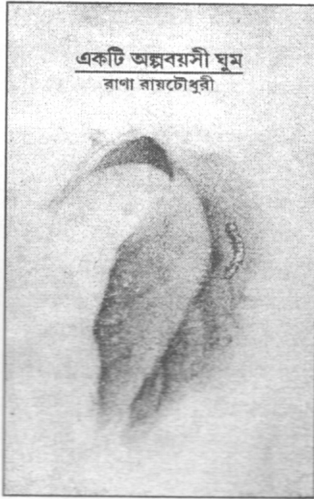
বিশেষ করে *যাদবপুরের মোড়* (নিজের কবিতার প্রতি নিজেরই প্রশংসা শুনে পাঠক হয়তো হাসবেন)! তবু বলি, কবিতাটি লিখে আমি খুব তৃপ্ত ছিলাম। কবিতাটিকে আজ আমার নানাভাবে দেখতে ইচ্ছে করে। কখনো প্রেমের কবিতা, কখনো মৃত্যুর প্রতীক বলে মনে হয়। হয়তো কবিতাটির মধ্যে একধরনের নিরাসক্তির ইঙ্গিতও ছিল, হয়তো দর্শনও ছিল পুরো মাত্রায়।

কবিতাটি মাথায় আসে ঢাকুরিয়া স্টেশনে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে। যেতে ইচ্ছে করছিল না অফিস, শেষে ভাবলাম, যাই। লড়াই-এরও তো শেষ আছে। একদিন আমার এই ক্লান্তি, অনিচ্ছা, লড়াই হয়তো থামবে যাদবপুরের মোড়ের পর। হয়তো যাদবপুরের মোড়ের পরেই আমি দেখব নতুন সকাল! আমার মৃত্যুর আনন্দের সকাল!

কবিতাটি শেষমেশ আমি লিখেছিলাম ক্যামাক স্ট্রিটের একটা ব্যাঙ্কে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। সেখানে আমার ব্যক্তিগত কোনো অ্যাকাউন্ট ছিল না (পয়সাই ছিল না, তার আবার অ্যাকাউন্ট)! অ্যাকাউন্ট ছিল আমার অফিসের। ব্যাঙ্ক কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বললাম, একটা উইথড্রয়াল স্লিপ দিন তো। যেন টাকা তুলব, এমন ভাব! সেই 'দারুণ' উইথড্রয়াল স্লিপেই লিখেছিলাম, *যাদবপুরের মোড়* কবিতাটি। লিখেছিলাম মানে, ড্রাফ্‌ট করেছিলাম। লেখাটি চার-পাঁচবারের পর কমপ্লিট লেখা হয়ে উঠেছিল বলে আমার মনে হয়েছে।

আর *বিকেল* কবিতাটা লিখেছিলাম কল্যাণীতে, এক বিকেলবেলা প্রীতিভূষণ চাকির বাড়ি বেড়াতে গিয়ে। উফ্! অ্যাকে কল্যাণী, আমার প্রিয় শহর! তায়তে আবার বিকেলের কল্যাণী! চওড়া-চওড়া রাস্তায় দারুণ-দারুণ সুন্দর সব বালিকা-তরুণীর দল বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছিল। ওই দেখেই আমার মাথা খারাপ! নতুন কবি হচ্ছি, মনের মধ্যে প্রেম-বিকেল-কল্যাণী-মেয়েদের নিষ্পাপ ঠোঁট, সব মিলিয়ে হয়ে উঠল আমার নতুন কবিতা *বিকেল*।

এরকম পাঁচ-ছটা স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা ছিল *একটি অল্পবয়সী ঘুম*-এ। বাকি সব, এখন মনে হয় নির্মাণ করেছিলাম। বানিয়ে-বানিয়ে কিছুটা। কিছুটা অল্পবয়সের আবেগ। কিছুটা কবিত্ব। কিছুটা বিষণ্ণতা-মায়া থেকেই অন্য কবিতাগুলো গড়ে উঠেছিল হয়তো। পাঠকগণ দু-চারটে বাদে বাকিগুলো পড়ে হাসাহাসিই করেছিলেন বলে মনে হয় এখন আমার।



একটি অল্পবয়সী ঘুম আমি বিক্রি করেছিলাম হকারের মতো ছিয়ানব্বই-এর বইমেলায়। তখন প্রসূন-শিবাশিস-সাম্যব্রতরা আমার পরিচিত কাম বন্ধু ছিল। শিবাশিস কিনেছিল, প্রশংসাও করেছিল বইটার, মনে আছে। বড়ো কবিদের তরুণ কবির বই গিফ্ট করতে হয়, তাই করেছিলাম জয়দাকে আর ভাস্করদাকে। ভাস্করদা মনে আছে, (বইটির মাধ্যমে প্রথম আলাপ ওঁর সঙ্গে) বইটি তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরিতে ডিসপ্লে করেছিলেন। ওই ডিসপ্লেই আমার জীবনের কবিতা লেখার প্রথম পুরস্কার। দু-চারটে কবিতা বাদে ভাস্করদা বইটি সম্পর্কে নীরবই ছিলেন। তবু ডিসপ্লে করেছিলেন কেন? হয়তো তরুণ কবিকে উৎসাহ দিতে, অথবা বইটার দারুণ প্রোডাকশন ওঁকে টেনেছিল! জানি না কেন?

আজ এত বছর বাদে, সুস্নাত চৌধুরীর দৌলতে যখন *একটি অল্পবয়সী ঘুম*-এর হিসেব করতে বসি, তখন মনে হয় — বইটি না লিখলেও বাংলা কবিতার কিস্যু এসে যেত না। বরং বাংলা কবিতার এত দিকপাল সব লেখার মাঝে আমি ভার বাড়িয়েছি অপাঠ্যের। আজ কত তরুণ ভালো-ভালো লিখছেন। কত-কত দারুণ-দারুণ সব বই। আর 'প্রথম বই' হিসেবে কতসব অবিস্মরণীয় বই যে ইতিহাস হয়ে আছে বাংলা কবিতায়, সেখানে আমার প্রথম বই নিয়ে এত কথা — হয়তো পাঠকের প্রতি অন্যায়ই করে ফেললাম। পাঠক মাফ করবেন! আমার প্রথম বই হয়তো বাংলা সাহিত্যের বোঝাকেই বাড়িয়ে তুলেছে। আজ সেই গ্লানিতেই আমি প্রতি মুহূর্তে কষ্ট পাই। ক্ষমা চাইব কার কাছে? ক্ষমা চাই, ক্ষমা চাই কল্যাণীর বিকেলের কাছে। ক্ষমা চাই যাদবপুরের মোড়ের কাছে। ক্ষমা চাই জাতীয় পাখির কাছে। গানের কাছে ক্ষমা চাই। ক্ষমা চাই ছন্দের কাছেও।

স্বরশয্যা

সার্থক রায়চৌধুরী

মুক্তাঙ্গনের পাশে বিশুদার দু-কাপ চা খেয়ে বা খেতে-খেতে একটা বাঁক-নেওয়া রানিং ২৪/২৯ ধরে টালিগঞ্জ ট্রামডিপোর একটু আগে পুলিশ কোয়ার্টার্স বা বাঙ্গুরের সামনে আবার রানিং-এই নেমে পড়তাম। গন্তব্য আমার প্রকাশক কল্যাণদা (কল্যাণ সরকার)-র বাসগৃহ। কবিতা তো লিখেই চলেছিলাম। ছাপাও হয়েছে বিস্তর। তবে বই করার কথা সেভাবে কখনোই মাথায় আসেনি। প্রস্তাব যে পাইনি, তা নয়। অনেকেই সরাসরি, কেউ-কেউ পরোক্ষে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, আমি প্রস্তুত হতে পারিনি কোনোদিন। বই বার করব, হ্যাঁ, করব..., কবে? সেভাবে ভাবিনি। লিখছিলাম। লেখা চলছিল...।

এম এস সি পাশ করে গবেষণার পাশাপাশি তখন দু-বেলা টিউশন চলত। চলত সারা শহরময় ঘুরে বেড়ানো। দিনে, দুপুরে, সন্ধ্যায়, রাতে। অতি গভীর রাতে। তখনও দূরদর্শন ছাড়া, প্রাইভেট চ্যানেল বাজারে আসেনি। রাহুলদা (রাহুল পুরকায়স্থ) তখন *দর্পণ* (প্রথম টিভি নিউজ ম্যাগাজিন)-এ কাজ করে। রাহুলদাই আমাকে *দর্পণ*-এ ক্যামেরা-রিপোর্টার-এর একটা কাজে ডেকে নিল। সেটা ছিল একটা উত্তাল সময়। টিউশন, ভোটের বাজারে *দর্পণ*-এর কাজ, গবেষণার টুকটাক পড়াশোনা আর কাজশেষে দীর্ঘ-দীর্ঘ সব আড্ডার সেশন। আমি-ব্রতী-রাহুলদা। রাহুলদা-তুষারদা-ওল্ড মংক। বক্কা-গাঁজা-অলিম্পিয়া। কফি হাউস-অনির্বাণ-অয়ন। সৌম্য-অমিতাভ-তাপি-হিন্দু হোস্টেল। ভৈটেকি-খালাসিটোলা-প্রমোদদার ক্যান্টিন। রজত-রাজাদা-কালীঘাট। ক্যারোলিন-পূজা-স্টিলশট। অনির্বাণদা-মার্জিনস-আমার পরিত্যক্ত মামার বাড়ি। পাশাপাশি মাঝেমধ্যেই অনীকদা-শৌভিক-অম্পাদাদের যাকে বলে 'ভয়ানক নাজুক চক্কর' (যেটা ঘটত দক্ষিণের 'মুক্তাঞ্চল' যাদবপুর ৮বি অঞ্চলে)। আর তাছাড়া, বিডন স্ট্রিট সংলগ্ন 'হরিঘোষের গোয়াল' তো ছিলই। বৈঠকখানায় দুটো তক্তপোশ। একটায় আমি, অভীক, সুমন্ত। যে দিন অনির্বাণ থাকত, সেদিন আমরা দলে একটু ভারী বোধ করতাম। উলটোদিকে বাংলার দুই দিকপাল : অচ্যুত মণ্ডল এবং অভীক মজুমদার। একজন বাংলার বাঘ আর অন্যজন ক্লান্ত রিং-মাস্টার। রবার্তো-বেবেতো এই জোড়া ফলার সামনে আমরা সামান্য দিলীপ পালিত, সুধীর কর্মকারদের দল। কারো কোনো লেখাই 'কিস্যু হয়নি'। বাংলা ভাষাটাই বোধহয় জানি না। তন্ময়দা মাঝে-মাঝে আসত। তন্ময়দা মূলত শ্রোতা। আজ বুঝতে পারি ওই কটূক্তি, সমালোচনা, তর্কের ঝড়, সন্ধের পর সন্ধের আড্ডা আমাকে কী শিখিয়ে গিয়েছে।

প্রায় প্রতি রোববার সকালেই হানা দিতাম জয়দেবদার দমদমের আড়াই নং গেটের বাড়িতে। একটার পর একটা কবিতা ধৈর্য ধরে শুনত। মতামত দিত। কবিতা পড়তে শেখাত জয়দেবদা। একটার পর একটা বই পড়তে দিত। আর ফেরার সময় দশ-বিশ টাকার নোট গুঁজে দিত হাতে (তখন আমি টিউশন করি না)।

এভাবেই চলছিল। সেটা ১৯৯৯ সাল। আটানব্বই-এ আমি আর ঋতু বিয়ে করেছি। টিউশন আর স্কলারশিপের টাকায় সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছি। লেখালিখি শিকেয় উঠেছে। একদিন রাহুলদা আমাকে নিয়ে গেল কল্যাণদার বাড়িতে। কল্যাণদার কথা এখানে বলতে গেলে একটা বড়ো গল্প লেখা হয়ে যাবে, তাই সে কথা পরে অন্য কোথাও হবে। কল্যাণদার দুটো প্রকাশন : *ব-দ্বীপ* আর *কোলকাতা*। সে বছর উনি দুটো বই প্রকাশ করতে চলেছেন একটা রাহুলদার কবিতা, আর-একটা কৃষ্ণদা (কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত)-র গদ্যের বই। আমার লেখা পড়ে ওঁর ভালো লেগেছিল। উনি আমার প্রথম বই প্রকাশ করতে চান। সেটা অক্টোবরের মাঝামাঝি। হাতে সময় প্রায় নেই বললেই চলে। এরমধ্যেই আকাশের রং বেগুনি হচ্ছিল। কী যেন এক অশান্ত উল্লাসে বদলে যাচ্ছিল সব। আর এই বদলে যাওয়ার ছাপ ক্রমাগত আমার লেখাকে অস্থির করে তুলছিল। বিগত দশ-বারো বছরের লেখা। কোনোটা অসমাপ্ত, কোনোটা আঁচড়মাত্র, কোনোটা শুধু মাথাতেই রয়ে

গেছে। শুরু করলাম বাছাবাছির কাজ। তারমধ্যেই চলতে থাকল আরও-আরও লেখা। বই করতে গিয়ে আমি আবার লিখতে শুরু করে দিলাম।

দেবা (দেবাদিত্য দত্ত) আমার স্কুলের বন্ধু। ওর মতো নিখুঁত ছবি খুব কম লোকই আঁকতে পারে। বই-এর নামটা লিখতে-লিখতেই মাথায় এসেছিল। প্রচ্ছদের প্ল্যানটাও করে ফেলেছিলাম — আমার জানলার ভেতর দিয়ে দেখা রাতের ছবি। দেবা ওটা প্রায় চোখ বন্ধ করেই এঁকে দিল। প্রচ্ছদ হয়ে গেল, কিন্তু পাণ্ডুলিপিই তখনও হয়নি।

একটা মোটা লাল ক্লিপ ফাইল কেনা হয়েছে। বাবা-মা লখনউতে (মামার বাড়ি)। পুজোর ছুটি শেষ হবে-হবে। ঋতু বাড়ি সামলাচ্ছে। আমার নির্বাচিত লেখাগুলো একটার পর একটা ফেয়ার করে দিচ্ছে, পড়ে মতামত দিচ্ছে। আমি ফেয়ার কপিগুলোকেও সংশোধন করে আবার আনফেয়ার করছি। ও আবার ফেয়ার করে দিচ্ছে। টানা প্রায় দেড় মাসের এই ফেয়ারি-টেলের শেষে যা দাঁড়াল, তা হল একটা তিরানব্বই পাতার পাণ্ডুলিপি। কল্যাণদা বললেন, ফর্মায় মিলবে না। আরও তিন পৃষ্ঠা বাড়াও অথবা তেরো পৃষ্ঠা কমাও। আমি তিন পৃষ্ঠা বাড়িয়ে ছিয়ানব্বই পাতার বই-এর পাণ্ডুলিপি ওঁর হাতে তুলে দিলাম।



একজন কবির প্রথম কবিতার বই, তা-ও আবার ছিয়ানব্বই পাতার! কেউ বলল : দুটো বই হয়। কেউ বললেন : কিছু লেখা রেখে দাও, পাঁচ বছর বাদে আরেকটা বই হয়ে যাবে — মার্কেটে থাকতে গেলে স্ট্র্যাটেজিক হতে হয়। কেউ বললেন : প্রচ্ছদটা বড়ো স্ট্রেটকাট, একটু অ্যাবস্ট্র্যাক্ট হলে ভালো হত। আমি স্ট্রেট ব্যাটেই খেলে এসেছি। বিগত দশ-বারো বছরে যা লিখেছি, তা আর জমিয়ে রাখতে চাইনি। ফলে ছিয়ানব্বই পাতার আমার প্রস্তাবিত প্রচ্ছদে মোড়া বইটি-ই চূড়ান্ত বলে জানিয়ে দিলাম।

আমি ডিক্টেট করে যাচ্ছি আর ত্রিদিব কম্পিউটারে টাইপ করে চলেছে। একবার কমা কেটে সেমিকোলন, পরমুহূর্তেই সেমিকোলন কেটে দাঁড়ি, তারপর দাঁড়ি মুছে লিডার... ত্রিদিব আমায় জিজ্ঞেস করেছিল — আচ্ছা সার্থকদা, অ্যাতো বই-এর কাজ করলাম। কেউ তো আপনার মতো '...' ব্যবহার করে না? আমি একটু ভেবে বলেছিলাম — আসলে বিন্দু-বিন্দু জমে সিন্ধু হয় কিনা... তাই...। ত্রিদিবের নামটা বইতে উল্লেখ করতে আমি ভুলিনি। ত্রিদিবকেও নয়।

প্রচ্ছদটা সম্পূর্ণ কালোর ব্যাকড্রপে একটা রাতের জানলা ভেসে থাকবে — এরকমই এঁকে দেওয়া হয়েছিল। অর্পিতাদি (ঘোষ) আরও সুন্দর লাগবে ভেবে জানলার চারপাশে সাদা বর্ডার রেখে আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। একটা স্কেল আর কালো ফেল্টপেন নিয়ে বসে সারারাত সেই সাদা বর্ডারগুলো কালো করে চলেছি আমি — আর ঋতু বইগুলো তোশকের তলায় পেতে-পেতে রাখছে, যার ওপর সারারাত আমরা আমাদের দেহভার এলিয়ে দেব যাতে কাঁচা আঠা (বাইন্ডিং) পাকা হয়ে ওঠে। সার-সার নিজের বই-এর ওপর শুয়ে থাকার অনুভূতি বলে বোঝানো যায় না।

বই করার আগে কবিতাগুলো, তাদের বানান, লাইন সাজানো — এই বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছিলাম অভীকদা আর জয়দেবদার কাছে। পরেরবারও হানা দেব ভেবেই রেখেছি। একটা লাইন নিয়ে খুঁতখুঁতানি যাচ্ছিল না — 'ঝুপ্ করে নামে একঝাঁক টিয়াপাখি'। কেন মনঃপূত হচ্ছে না বুঝতে পারছি না। সোজা চলে গেলাম জয়দার (কৃষ্ণ প্লাসের কাছে) বাড়িতে। জয়দা অনেক ক-টা লেখা শুনলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, আচ্ছা টিয়াপাখি কি ঝুপ্ করে নামে? আমি বললাম, না তো, ঝটপট করে নামে! ...ব্যস, প্রবলেম সল্‌ভড। এই হল জয়দা (জয় গোস্বামী)। এক মুহূর্তে আমার খুঁতখুঁতানি দূর হয়ে গেল।

বইমেলা শুরু হয়ে গেছে (২০০০ খ্রিস্টাব্দ)। মেট্রোয় চড়ে ওয়েলিংটনের বাঁধাইখানা থেকে দ্বিতীয় লটের বইগুলো ঝোলা ভর্তি করে আনতে চলেছি। আবার জয়দার সঙ্গে দেখা। বললাম, আজই প্রথম কবিতার বই মেলার স্টলগুলোতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি। বেশ ভয়-ভয়-ও করছে। জয়দা একটু হেসে একটা কথা বলেছিলেন — জানো, আমার আর প্রথম কবিতার বই বেরোবে না!... — আজও কানে বাজে।

কল্যাণদার স্বপ্নের শেষ ছিল না। দামি পাতা, ঝকঝকে ছাপা, এই ডিস্ট্রিবিউটর, ওই সমালোচক, আরও কত কী। কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। আমি কল্যাণদার অবস্থাটা বুঝতাম, তাই ঠিক-ই করেছিলাম বই বিক্রি করে ওঁর ধারটা (বাজারে টাকা ধার করে বই করে দিয়েছিলেন কাউকে না জানিয়ে) মেটাতে সাহায্য করব। তখনও লিটল ম্যাগাজিনদের বইমেলার দু-খোপে পুরে দেওয়া হয়নি। ফলে সারা মেলা জুড়েই ছড়িয়ে থাকত তাদের টেবিল, স্টল, শতরঞ্চি। আমি বাংলার সমস্ত লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশক ও প্রকাশনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। প্রত্যেকে আমার পাঁচ কপি করে বই তাঁদের স্টলে রেখেছিলেন এবং বইগুলো (কী কারণে জানি না) বিক্রিও হয়ে গিয়েছিল বইমেলা শেষ হওয়ার আগেই। আমি বই বিক্রির টাকা কল্যাণদার হাতে দিয়েছিলাম। কল্যাণদা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলেছিলেন, প্রফিট, আমি জীবনে প্রথম একটা কবিতার বই করে প্রফিট করলাম সার্থক!

কল্যাণদা নেই। আলো, হাওয়া, জল, আগুন আর মাটিকে উৎসর্গ করা বইটার দু-কপি এখনও আমার কাছে রয়ে গেছে। সত্যিই... আমারও আর প্রথম কবিতার বই কখনও বেরোবে না!

এগুলোইতো মৃত্যুর অনুভূতি

শৈবাল সরকার

ধরা যাক একটা রাস্তা আর তার দুই পাশে তোমার ডানার মতো ঝুঁকে থাকা সারি-সারি গাছ। গাছের ফাঁকে আমার ঈর্ষা আর ইচ্ছা। ওদের দলে ভিড়ে যাবার। ওদের স্মৃতি থেকে কয়েকটা দমকা বাতাস তুলে নেবার। ফলে বাড়ি ফেরার পথগুলো আরও দীর্ঘ একটা স্লিপিং ব্যাগের খোঁজে পিছিয়ে পড়ছিল। এইরকম একটা ক্রমাগত পিছিয়ে যাওয়া আর ঝাপসা একটা মোমবাতির সময়ে *লালন* পত্রিকা থেকে একগুচ্ছ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। আমাকে প্রস্তাব দেওয়ার আগে আর যে কবিদের বাছা হয়েছিল তাঁরা হলেন — অতনু সিংহ (*নেভানো অডিটোরিয়াম*), হিমাদ্রি মুখোপাধ্যায় (*যারা চুরি হয়ে যায়*), স্বাগতা দাশগুপ্ত (*কুক্কুরী ও তাহার প্রেমিক*) এবং হিমালয় জানা (*ভূতের শহর থেকে*)। এঁরা প্রত্যেকেই আমার প্রিয় কবিদের দলে। ফলে আমার বইকেও এঁদের দলে ঢুকিয়ে দেওয়ার লোভ সামলানো গেল না। দুঃখের বিষয় শেষ পর্যন্ত অন্য সব বইগুলো প্রকাশ পেলেও হিমালয়ের বইটি দলছুট রয়ে গেল।

লালন থেকে প্রকাশের জন্য চাওয়া হয়েছিল চুয়ান্নটি কবিতা। হিমাদ্রি সাহায্য

না করলে এতগুলো লেখা আদৌ খুঁজে পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। প্রস্তুতির অভাব আমার চিরকালীন। তাই ফলাফলে তার প্রভাবও চিরস্থায়ী। ফলে এক লেখা, বহুবার কাটাকুটির পর একটা লেখা, হয়তো কিছুটা হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে বলতে, পরবর্তী কাটাকুটির জন্য বিবেচ্য হয়। ফলে আমার কোনো কবিতাই সম্পূর্ণ নয়। প্রায় প্রতি সাক্ষাতেই নতুন লাইন যেমন যোগ হয়েছে, তেমনি বাদও গেছে অনেক লাইন। এই পদ্ধতিটার প্রথম হোঁচট — বই প্রকাশ। পত্রিকায় প্রকাশ হবার পরেও অনেক লেখার গঠন নিয়ে আমার আপত্তি ছিল কিন্তু তখনও সুযোগ থেকে গিয়েছিল, বই প্রকাশ হলে সেটা শুধরে নেবার। তা যে হয়নি, বোঝা গেল বই প্রকাশের পর। দেখা গেল অনেক লেখাই হয়তো আর একটু ভালো করে লেখা যেত। আসলে সীমাহীন একটা মৃত্যুর যৌনতা আমাকে ঘিরে ছিল আর আমি খুঁজছিলাম এমন এক আরোগ্য যাতে ভর করে ছবি ও কবিতার মাঝামাঝি কোথাও দিশাহীন ঘুমিয়ে পড়তে পারি। অথচ বাদুড়ের অভিশাপে ভেসে যেতে আমি প্রতিবার জেগে থাকতাম, আর একটা ভূতের গল্প আমাকে শুনতে হত রোজ। *একুশ নম্বর ভালো থাকা*-র কবিতাগুলিও তাই... জেগে থাকা আর প্রতিরাতে ক্লান্তিকর ঘরে ফিরে আসা। ফিরে আসার অনিচ্ছা নিয়ে রচিত এই গ্রন্থে তাই একটা অমীমাংসিত মৃত্যুর আবহ।



প্রথম প্রকাশের রোমান্টিক আবহ ছাপিয়ে তাই রয়ে গেছে এক অসমাপ্ত বিষাদ। একধরনের ব্যর্থতা। যে লেখাগুলো ছিল পরিবর্তনশীল, প্রতিটি উড়ানের আগে যাদের ডানা নতুন করে গজাত, তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক মৃত্যু আর ঘেমে ওঠা একধরনের যৌনতায় কেঁপে ওঠার কবিতাপ্রয়াস। আমার কবিতাবোধ নিয়তিতাড়িত আর সেই সব আকস্মিক বোধ ও না-পাওয়া বোধির এক অক্ষম প্রয়াস আমার প্রথম কবিতার বই। একটা ছোটোখাটো মহেঞ্জোদড়ো, যেখানে চুয়ান্নটি কবিতার দেহ রয়ে গেছে, ভাষাহীন এক ভালোবাসার জীবাশ্ম হয়ে। যা-কিছু জ্যান্ত, তা হল অমিতদার (অমিত লস্কর) করা প্রচ্ছদ আর অতনুর (অতনু সিংহ) উদ্ভ্রান্ত উদ্দীপনা। বাকিটা একটা শোকপ্রস্তাব। এ সকল মৃত্যুর আবহে এবার নীরবতা পালন... যার হাতে যতটা ক্ষরণযোগ্য সময় রয়েছে ততটা সময় ধরে...

ঋণ : নামকরণের পঙ্‌ক্তিটি হিমাদ্রি মুখোপাধ্যায়ের *যারা চুরি হয়ে যায়* কবিতা থেকে নেওয়া।

যেটা খুশি বেঁচে নাও...

দীপাংশু আচার্য

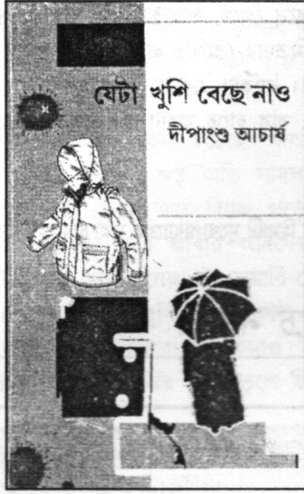
ইনফ্যাক্ট আমার বোধবুদ্ধির কারণেই আমি বুঝতে শিখেছি — বোধ আর বুদ্ধি এক জিনিস নয়। এরা থাকে পাশাপাশি। নাম ও পদবির মতো। ডান চোখ ও বাঁ চোখের ন্যায়। কিন্তু ব্যস। ওই ও-টুকুই।

বুদ্ধিমান লোকেরা ডিবেটে ফার্স্ট হয়। অঙ্কে বিরাশি পায়। চন্দ্রবিন্দুর গান শোনে। কিন্তু, ফ্র্যাংকলি স্পিকিং, কবিতা লেখার সঙ্গে বুদ্ধির কোনওভাবেই কোনও প্রত্যক্ষ আদিখ্যেতা নেই। ছিল না কখনও।

'বুদ্ধি' বিষয়টার মধ্যে একপ্রকার 'প্রণতি' আছে। স্যালুটবাচক। কুর্নিশমুখী। লজিকের প্রতি, তথ্যের প্রতি, শৃঙ্খলার প্রতি এক সচেতন (অথচ নিহিত) আনুগত্য। ঘটমান যার কাছে প্রফেট, বর্ণনা যার কাছে প্রতিসাম্য, ক্যালাইডোস্কোপ যার কাছে খেলনা — সে বুদ্ধিমান বটে। কবি নয়।

যেটা খুশি বেছে নাও — বুদ্ধিমান কিশোরের লেখা পঁয়ত্রিশটি চিঠির সংকলন। প্রত্যেকটি আলাদা-আলাদা মানুষের উদ্দেশে। মা, বাবা, কলিগ, রাষ্ট্রপতি, মাস্টারমশাই, এক নম্বর প্রেমিকা, দু-নম্বর প্রেমিকা, তিন নম্বর প্রেমিকা, একাত্তর নম্বর প্রেমিকা, কমরেড ইত্যাদিদের ঠিকানায় পাঠানো। মজার বিষয় চিঠিগুলির নির্মাণে। সাবলীল ছন্দ ও আশ্চর্য অন্ত্যমিল চিঠিগুলিকে সাহিত্য হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। কিন্তু যেহেতু, সাহিত্যমাত্রেই তা কবিতা নয় এবং সানগ্লাস

পরলে তোমায় বেশ দ্যাখায়, তবে না পরলেও — তুমি তুমিই, সেহেতু, *যেটা খুশি বেছে নাও*-কে আপনি স্মার্ট বলুন। বিক্রয়যোগ্য বলুন। টাইম পাস বলুন। কাব্যগ্রন্থ বলবেন না। ভুলেও।



হ্যাঁ, মারাদোনার ড্রিবল দেখলে যেমন অনুপম ইমেজারি মনে হয়, গোবাদির সিনেমা শেষে যেরম বলে ফেলি — উফ্ — এতো কবিতা! সেরকম এক-আধটা লাইন এই বই-এও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পাবেন, যেগুলি মনে হতে পারে অবচেতনের ক্লু, ড্রয়ারে ঘুমিয়ে থাকা বোধ। কিন্তু বাদবাকি কর্পোরেট সহপঙ্‌ক্তির ভিড়ে ও নিয়নে, আগাম ভ্রূণের মতো অপ্রস্তুত, তাৎক্ষণিক টাঙ্কির মতো আন্‌তাবড়ি এবং বলতে নেই, ম্যান অব দ্য ম্যাচের মতো নিঃসঙ্গ। সমবেদনা ও আন্ডারলাইন ছাড়া ওদের দেওয়ার কিছু নেই। লণ্ঠনখচিত রাতে ওদের পুনর্জন্ম হোক।

যদি ভেবে থাকেন, এটিকে আমার প্রথম বই হিসেবে অস্বীকার করছি, আপনি ফ্যান্টাসাইজ করছেন। ভীষণভাবে স্বীকার করছি বরং। যে ভদ্রলোক আজ মিছিলে হাঁটছেন, তাঁরও হামাগুড়ি ছিল মেঝের পর মেঝে। আরে বাবা, বাসুদেব দাশগুপ্ত তো আর এমনি-এমনি বলেননি — আগের লেখা 'আমার কাছে খুবই মূল্যবান কেননা সবটাই আমার হয়ে ওঠার ইতিহাস'। কী-কী থাকা সত্ত্বেও যেটা খুশি বেছে নেওয়া যায়নি, বল্লাম। কী-কী 'না থাকা' ছিল বইটিতে, বলা দরকার। একটি কবিতা অবশ্যই একটি চিঠি। কিন্তু তার কোনো সুনিশ্চিত ব্যক্তিগত ডাকবাক্স নেই। এমন একজনের উদ্দেশে এটি লেখা, যিনি অজানা, রহস্যময় এবং বিশুদ্ধ। যে লিখছে সে একটি নীল জাতিস্মর। ব্রহ্ম তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সে লিখছে, কারণ তার নাভি থেকে উঠে এসেছে মায়া।

এবার যেই তৃতীয় কেউ পড়ে ফেলল সেই চিঠি, একটি কবিতা জন্মাল। এভাবে প্রতিটি পাঠ একটি নতুন কবিতা স্পন্দিত করল চরাচরে।

আনফরচুনেটলি, সবার উপর পাঠক সত্য তাহার উপর অভিজ্ঞান। আলোচ্য গ্রন্থের সমস্ত লেখা প্রতিবার অনুরূপ ও একরৈখিক পার্কে এনে উপস্থিত করে আমাদের। কবিতার সৎ পাঠকের কাছে এই ক্যালাইডোস্কোপ-হীনতা অমার্জনীয়। যেদিন বুঝতে শিখলাম, ক্যালাইডোস্কোপ খেলনা নয় শুধুমাত্র, অনেকটা দেরি হয়ে গ্যাছে। দেখলাম, *সপ্তর্ষি*-র স্টলে বিক্রি হচ্ছে বইটা। গাঙ্গুলিবাবু হলে বলতাম — জুতোয় পেরেক ছিল। এই আর কি!

কবে আমি বাহির হলেম

অভীক মজুমদার

কবি-কাহিনী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

ও

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা

মেছুয়াবাজার-রোডের ৪৯ সংখ্যক ভবনে
সরস্বতী যন্ত্রে
শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৩৫।

I once boasted, copying the phrase from a letter of my father's, that I would write a poem 'Cold and passionate as the dawn'. — W B Yeats, *General Introduction for My Work*

ঘুরে-ফিরে সেই রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *কবিকাহিনী* (১৮৭৮) প্রসঙ্গে লিখেছিলেন তিনি — '...প্রকাশের পূর্ণতায় যা পৌঁছয়নি তারও মূল্য আছে হয়তো, ইতিহাসে, মনোবিজ্ঞানে; তাই সাহিত্যের অবজ্ঞা এড়িয়েও সে প্রকাশকের পাসপোর্ট পেয়ে থাকে'। কেন লিখলেন এমন বাক্য? কারণ এ-বই প্রকাশ করেছিলেন তাঁর বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ — কবির অজান্তে। *জীবনস্মৃতি*-তে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, 'কাজটা ভালো করিয়াছিলেন তাহা আমি মনে করি না।'

তরুণ কবি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে এতটা বিরূপ সাধারণত থাকেন না। বরং সেখানে থাকে স্বাভাবিক অপত্যস্নেহ, খানিকটা দুর্বলতা, পরবর্তীকালে কিঞ্চিৎ স্মৃতিমেদুর অহংকার। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু একটু সংকোচবিহ্বল। 'নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে।' আরও কঠোর সুরে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিতে জানান (১৯৩৮) — 'দ্রৌপদীর লজ্জা শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করেছিলেন, আমার কবিতার লজ্জা তোমরা রাখলে না। ...কবিকাহিনীতে ভগ্নহৃদয়ে অল্প-স্বল্প পাক ধরেছে, এই জন্যেই ওদের কৃত্রিম প্রগল্ভতাকেই বলা যায় জ্যাঠামি। সদরে তার প্রদর্শনীটা ভালো নয়।' সুর আরও চড়ল ওই চিঠিতেই, বললেন, ওই কাব্যগ্রন্থে, 'অনেকখানি আছে স্ত্রৈণতা, মা বলতে সে অজ্ঞান, আর প্রিয়ার তো কথাই নেই। আদুরে সাহিত্য, তাতে মেয়ের প্রশ্রয়ই বেশি, বেশ একটু আর্দ্রভাবের সেন্টিমেন্টালিটি।'

এসব তীক্ষ্ণ মন্তব্য একটি ছোট্ট প্রতিশোধ হিসেবে ফিরিয়ে দিল সেই *কবিকাহিনী*। অনেক বছর পরে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এক কপি *কবিকাহিনী* ১৮৭৮ সালেই পাঠিয়েছিলেন আনা তড়খড়কে। মাত্র একমাসের ঘনিষ্ঠতায় রবীন্দ্রনাথের কাছে আমৃত্যু উজ্জ্বল সেই মরাঠি কিশোরী আনা, সে-বছরই ২৬ নভেম্বর তারিখে একটি চিঠি লেখেন *কবিকাহিনী* প্রসঙ্গে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। বহুবছর পর, সেই চিঠি পুরোনো একটি বই-এর মধ্য থেকে আবিষ্কৃত হয়। সজনীকান্ত দাস জানাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ সেই চিঠি রথীন্দ্রনাথের হাতে দিয়ে বলেন, 'তোমরা রবীন্দ্র-যাদুঘর যদি করিতে চাও, এই পত্রটিকে সর্বাধিক গৌরবের স্থান দিও'। 'সর্বাধিক গৌরব' শুনে আমাদের বুক একটু কেঁপে ওঠে বৈকি! 'কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধহয় আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।' — বলেছিলেন যে আনা, তাঁর চিঠিকে 'সর্বাধিক গৌরব' দিতে বলছেন এক জীবনপ্রান্তে উপনীত কবি, নিশ্চয়ই মনে পড়ছে তাঁর সতেরো বছর বয়সের দিনগুলি-রাতগুলি। সেই মধুর মানবিক সম্পর্কের ছোঁয়া এসে লাগে আমাদের মনেও।

মেধা দিয়ে যে *কবিকাহিনী*-কে আক্রমণাত্মক ব্যাখ্যায় রক্তাক্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, হৃদয়ে সেই *কবিকাহিনী* রয়ে গেল নম্র এক সম্পর্কের ছায়াপ্রচ্ছায়া নিয়ে। জীবন কখন, কার জন্য কী বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়, কে জানে! প্রথম কবিতার বইকে সেজন্য, কবির হয়তো একটু সমঝে চলাই ভালো!

ফিরে যাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম মন্তব্যটির কাছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থের মূল্য রবীন্দ্রনাথের মতে সাধারণভাবে, 'ইতিহাসে' আর 'মনোবিজ্ঞানে'। একটু ভাবলে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এই কথার অন্দরমহলে খানিকটা ঢোকা যায়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের এক নীরব সূচকচিহ্ন। তার আবার দু-টি তল। একটি কবির কাব্যভুবনের ব্যক্তিগত রূপরেখার ইতিহাস, অন্যটি কাব্যক্ষেত্রের প্রেক্ষিতে বৃহত্তর অবস্থান। বিষয়টি আরেকটু খোলসা করে বলি। ধরা যাক, *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য*-টির (১৮৬০) প্রসঙ্গ। মধুসূদনের কাব্যমানচিত্রে তার ভূমিকা *মেঘনাদবধ কাব্য*-র পূর্বসূরি হিসেবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যদিও লিখেছিলেন, 'আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব।' — কিন্তু, তাকে নিয়ে স্বয়ং মাইকেল বা তাঁর পরবর্তী আলোচকরা সামান্য উদাসীন। 'গৌণ' এই কাব্যে অবশ্য লক্ষ করলে দেখা যাবে ওত পেতে বসে আছে 'মাইকেলি' বিবিধ প্রবণতার অন্তঃসার, ছন্দোকাঠামো বা উচ্চারণস্বকীয়তার বীজপুঞ্জ। আর বড়ো প্রেক্ষিত? যেন ভুলে না যাই (বেদনা পাই?) ওইসময়ে লেখা হচ্ছিল দ্বারকানাথ অধিকারীর *সুধীরঞ্জন* (১৮৫৫) অথবা দীনবন্ধু মিত্রের *সুরধুনী* (১৮৬২) কিংবা রঙ্গলালের *পদ্মিনী উপাখ্যান* (১৮৫৮)!

ইতিহাসের অন্য একটি দিকও আছে। সবাই মধুসূদনের মতো প্রথম আবির্ভাবেই তুফান কাঁধে নিয়ে আসেন না। অনেক কবি সচেতনভাবেই জানেন, তাঁর কবিতায় স্পষ্টতই শ্বাস ফেলেন পূর্ববর্তী প্রিয় কবিরা। আত্মজৈবনিক একটি ছোটো নিবন্ধে ডিলান টমাস এ প্রসঙ্গে (*Notes on the art of poetry*) লিখেছেন, পরিহাসের সুরে, 'I wrote endless imitations, though I never thought them to be imitations but, rather, wonderfully original things, like eggs laid by tigers'। এসব 'ব্যাঘ্রডিম্ব' প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান, কাব্যরচনার গোড়ার পর্বে তাঁকে প্রভাবিত করতেন, '...they ranged from writers of schoolboy adventure yarns to incomparable and inimitable masters like Blake'। প্রথম কাব্যগ্রন্থ হয়তো এক অর্থে কবির হিয়ার মাঝে লুকিয়ে থাকা এক কাব্যপাঠকের মুগ্ধতার দাপটে নিয়ন্ত্রিত, কবির আবেগঘন অনুরাগ-প্রশ্রয়ের ইতিহাসের টুকরো-টুকরো প্রতিবিম্বন ধরা আছে সেখানে। কে জানে, এ কারণেই হয়তো আমাদের সময়ের দুই ভিন্নরুচি-ভিন্নপ্রবণতার কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থে স্বীকৃতি থাকে এই 'প্রভাবিত' কবিসত্তার। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম *একা এবং কয়েকজন* আর মণিভূষণ ভট্টাচার্যের *কয়েকটি কণ্ঠস্বর*। পবিত্র মুখোপাধ্যায় আবার, আরও স্পষ্ট করে বলেন, *দর্পণে অনেক মুখ*। প্রসঙ্গত মনে রাখছি, দেবদাস আচার্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম *কালক্রম* ও *প্রতিধ্বনি*। প্রথম কাব্যগ্রন্থ হল ইতিহাসের সেই জলস্তর, যাকে ভেদ করে ক্রমে গড়ে উঠতে থাকে নিজস্ব মানচিত্র, মাথা তোলে পর্বত, মালভূমি, টিলা আর সূর্যশকট।

সুধীন্দ্রনাথ, এমনকী সম্ভ্রান্ত-সচেতন সুধীন্দ্রনাথ, প্রথম কাব্যগ্রন্থ *তন্বী*-র উৎসর্গপত্রে লেখেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্ঘ্য', তারপর সামান্য ছোটো হরফে, 'ঋণশোধের জন্য নয় ঋণস্বীকারের জন্য'। মুখবন্ধের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে জানান, 'পরবর্তী কবিতাগুলোর উপরে স্বদেশী বিদেশী অনেক কবিই ছায়াপাত করেছেন — সব সময়ে গ্রন্থকারের সম্মতিক্রমে নয়।' পাশাপাশি একথাও উল্লেখযোগ্য যে, কাব্যসংগ্রহে সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু *তন্বী*-কে রেখেছেন *দশমী*-রও পরে, একেবারে শেষে। শুরুতে রয়েছে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *অর্কেস্ট্রা*। বুদ্ধদেবের সাফাই ছিল এইরকম, '...কেননা, আমার বিশ্বাস, সুধীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে আদ্যন্ত পরিশোধন না-করে 'তন্বী'-র পুনঃপ্রকাশে রাজি হতেন না... তাই 'তন্বী'-কে এই গ্রন্থের প্রথমে স্থান দিতে আমার বিবেকে বাধলো।' পরিশোধন করলে অবশ্য সেটি কতদূর 'প্রথম' কাব্যগ্রন্থ থাকত সে-বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। আসলে, 'প্রথম' কাব্যগ্রন্থে 'কাঁচা' পদপাত থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে, কবির ক্রমবিবর্তন বা পরিণতির অভিযাত্রা খানিকদূর পাঠকের সামনে ধরা থাকে। *কৃত্তিবাস* পত্রিকার ষোড়শ সংকলনে (১৩৬৯) Peter Orlovsky-র একটি কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয় (অনুবাদক কে? বিষয়টি রহস্যাবৃত!)। কবিতাটির নাম *Frist Poem*। এই বানানভুল যে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত তার প্রমাণ কবিতার শেষে একটি পাদটীকায়, 'কবির মিষ্টি ভুল বানানগুলি অনুবাদে রক্ষিত হয়েছে'। সে কারণে কবিতা জুড়ে বেশ কিছু ভুল-বানানের শব্দ। যেন, 'প্রথম কবিতা'-র নির্যাসকে ধরার চেষ্টা। অন্যদিকে অনুবাদে চমৎকার কৌশলে কবিতাটির নাম হয়, *প্রমথ কবিতা*! শিবানুচরদের নিয়মভাঙা নৃত্যমত্ততার কোনো ইশারা? পুরো বিষয়টিকেই সামান্য রদবদল করে যদি 'প্রথম কাব্যগ্রন্থ'-র দিকে নিয়ে যাই, প্রবণতা-বৈশিষ্ট্যগুলি একই থাকে। উলটো দৃষ্টিকোণ বরং ফুটে ওঠে *অমিতাভ দাশগুপ্তর শ্রেষ্ঠ কবিতা* বইটিতে। তিনি সাজিয়েছেন সাম্প্রতিক কবিতা বা কাব্যগ্রন্থ থেকে উজান ঠেলে প্রথমের দিকে! কেন জানি মনে হয়, এভাবে সাজালে প্রথম কাব্যগ্রন্থের সামান্য অবহেলা হয়। প্রকৃতি-বিরুদ্ধতাও সম্ভবত!

২

'মনোবিজ্ঞান' প্রসঙ্গটা হঠাৎ তুললেন কেন রবীন্দ্রনাথ? প্রথম কাব্যগ্রন্থে কি সচেতন বা কখনো-কখনো অচেতনে মিশে থাকে কবির স্বকীয় কিছু প্রবণতা, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিজস্ব অনুভববীজ যা ক্রমশ মহীরুহ হয়ে ওঠে ভবিষ্যতে?

প্রশ্নটা সহজ নয়। ২০০২ সাল নাগাদ অনুবাদ করছিলাম মরাঠি কবি নামদেও ধসালের কবিতা। মুম্বই শহরের বাসিন্দা সম্মাননীয়-উদ্‌যাপিত এই কবির জীবনকাহিনি চমকপ্রদ। তাঁর জন্ম ১৯৪৭ সালে, পুনায়। অস্পৃশ্য-শূদ্র অর্থাৎ দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত এই কবি শৈশব কাটিয়েছেন মুম্বই শহরের যৌনকর্মী-পল্লীতে, যে অঞ্চলের নাম 'গোলপিঠা'। ধসালের বাবা ছিলেন ওই মহল্লার মাংসের দোকানের কসাই। ১৯৭২ সালে মার্কিন দেশের 'ব্ল্যাক প্যান্থার' আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নামদেও ধসাল বন্ধুদের সঙ্গে গড়ে তোলেন 'দলিত প্যান্থার' আন্দোলন। বহুবিচিত্র জীবনযাপনে বর্ণময়, অত্যাশ্চর্য এই কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম — *গোলপিঠা*। বর্তমানে মহারাষ্ট্রে মরাঠি স্নাতকস্তরে বইটি পাঠ্য! তাঁর কবিতায় আজও ছাপ ফেলে একধরনের মিশ্রমহল্লা-জগৎ, প্রান্তিক-সমাজবহির্ভূত-আলোআঁধারি-নেশাফুর্তিহিল্লার টানাপোড়েন। শিরাধমনীতে অভিজ্ঞতার চোরাস্রোত বিষয়ে তিনি সচেতন বলেই কি, নিজস্বতার ওই তল্লাটচিহ্ন প্রথম কাব্যগ্রন্থে? 'গোলপিঠা'? দলিত আন্দোলনের লিঙ্গ-শ্রেণি-বর্গ-মাত্রাও কি নির্ধারিত-নিরূপিত এক অর্থে হয়ে যায় না এই নামকরণে?

অন্যদিকে, গূঢ়ৈষণাদক্ষ বহু কবি কি অবচেতনায় বহন করেননি প্রথম কাব্যগ্রন্থের বিবিধ প্রবণতা বহুকাল জুড়ে? রূপকল্পে-প্রতীকে-অনুষঙ্গে ফিরে-ফিরে আসেনি কি প্রথম কাব্যগ্রন্থধৃত অনুভূতিমালা? কয়েকটি পঙ্‌ক্তির দিকে উলটোপথে এবার তাকানো যাক —

(ক) এখনি সমস্ত নৌকো ভোরবেলা গঙ্গায়
দু'তীরের পাশাপাশি অন্য শত চোখের কুয়াশা
কতো তুচ্ছ জেনে যাবে —
দিন আরো স্পষ্ট হলে যাত্রী হবো দক্ষিণসাগরী।

(খ) ফিরে দাও সাগরে আবার। ফিরে দাও উন্মাদ তুফানে
অস্তিত্বকে ফিরে দাও। বিপুল পৃথিবীময় পাথরের বুকে
আমি তার ভেঙে-পড়া দেখেছি গর্জনে। দেখেছি আছাড়
ডুবন্ত জাহাজ থেকে খুলে নেয় পাটাতন, জয়ের মাস্তুল।

(গ) ভাসোনি স্রোতের টানে, ভয় ছিল, প্রতিবন্ধকতা ছিল।
আমরা তো বিবিধ নৌকোয় তাঁর জয়গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে পড়েছি।

(ঘ) ঐ রণতরী থেকে মজ্জমান কাঠ আর আবর্জনা
ভেসে এলে ওদের দেহের ছিদ্রে ছিদ্রে গুঁজে দেবো — বলবো
আবার সমুদ্রে যাও, যুদ্ধে যাও, প্রাণপণে যুদ্ধ করো।

উদ্ধৃতিরহস্য শেষে পরিচয় উন্মোচন করি। (ক) আর (খ) নিয়েছি উৎপলকুমার বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *চৈত্রে রচিত কবিতা* (১৯৬১) থেকে (১২ আর ১৭ সংখ্যক কবিতা), তারপর (গ) আর (ঘ) নিয়েছি *সৌরলতা* (২০০৯) কাব্যগ্রন্থ থেকে (১২ আর ২০ সংখ্যক কবিতা)। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকুক, তাঁর দ্বিতীয় আর তৃতীয় বই অতিবিখ্যাত *পুরী সিরিজ* (১৯৬৪) আর *আবার পুরী সিরিজ* (১৯৭৮)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-এ তিনি নিজেই এই অনুক্রম পরিবেশন করেছেন! 'উতল সিন্ধুর জলে উড়ে যায় উত্তরী তোমার'। (*চিঠিপত্র*)

শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রে প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামকরণ বেশ বহুঅর্থদ্যোতনায় ঋদ্ধ। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে *বিমলার আত্মকথা* একটি ক্ষেত্রে শুরু হচ্ছে এই দ্বিতীয় বাক্যটিকে সঙ্গে নিয়ে — 'নিজেকে দেখবার আমি একটুও সময় পাইনি — আমার দিনগুলো রাতগুলো আমাকে নিয়ে একেবারে ঘূর্ণার মতো ঘুরছিল'। শঙ্খ ঘোষের কাব্যকৃতির দীর্ঘ রূপরেখা যদি বিচার করি, *দিনগুলি রাতগুলি* এভাবে স্পর্শ করে থাকে দু-টি প্রবণতা-স্তম্ভ। প্রথমটি রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিতীয়টি নারীর আত্মকথা। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিজগৎ আর সেই দীপ্ত অনুষঙ্গাবলি সূক্ষ্ম বুনোটে আত্মস্থ করে জাগে শঙ্খ ঘোষের কবিতা, আর অন্যদিকে *যমুনাবতী* থেকে *লজ্জা* ঘুরে তাঁর কবিতা পৌঁছোয় *ছোট্ট একটি কিশোরী বলছিল* কবিতায়। সচেতন-অবচেতনে মিলেমিশে ওই নামটি দ্বিস্তর-বৃত্তের স্থায়ী-অন্তরায় সুর তোলে।

তবে সচেতন প্রবণতা-নির্দেশও প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামের ক্ষেত্রে বা শরীরের আনাচে-কানাচে সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। চল্লিশের দুই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর অরুণকুমার সরকার সচেতনভাবেই তাঁদের ভিন্নভুবন-ভিন্নযাপন-ভিন্নপথের পরিচয় রাখেন প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামে। সুভাষ যেখানে *পদাতিক* সেখানে অরুণকুমার স্পষ্টতই মনোযোগের কেন্দ্রে আনেন *দূরের আকাশ*। পরবর্তীকালেও এই ভাবনার সম্প্রসারণ লক্ষ করা যায়। মন্দাক্রান্তা সেন, মউলি মিশ্র এবং সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামে স্পষ্ট ইশারা পাঠান পাঠকের দরবারে। *হৃদয় অবাধ্য মেয়ে* মন্দাক্রান্তার, *বাংলা মাধ্যমের মেয়ে* মউলির আর *বৃষ্টিরাশির মেয়ে* সম্রাজ্ঞীর। (প্রসঙ্গত মনে রাখছি, মল্লিকা সেনগুপ্তের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম, *আমি সিন্ধুর মেয়ে*।)

বাংলা কবিতায় আজও মাথায় বহুস্তরিক অর্থ-অভিমুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অলোকরঞ্জনের *যৌবন বাউল*, শৈলেশ্বর ঘোষের *জন্মনিয়ন্ত্রণ*, গৌতম বসুর *অন্নপূর্ণা ও শুভকাল*, কমল চক্রবর্তীর *চার নম্বর ফার্নেস চার্জড*, রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর *আরশি নগর* বা অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আহিরীটোলা*। শোনা যায় দৃপ্ত কণ্ঠস্বর, নবারুণ ভট্টাচার্যের *এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না* কিংবা নির্মল হালদারের *অস্ত্রের নীরবতা*। আর বিনয়বচন, *আমাদের লাজুক কবিতা* (রণজিৎ দাশ) বা *নেহাত গরিব নেহাত ছোটো* (বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়)।

৩

দিনকাল পালটেছে। কবি-উচ্চাশা আর প্রকাশক-প্রকল্পের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বিস্তর এলোমেলো হাওয়া। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ তরুণ কবির কাছে সেকালেও ছিল প্রবল অনিশ্চয়তা, উপেক্ষা আর অসম্ভাব্যতায় কণ্টকাকীর্ণ, আজও তাই। ইদানীং অবশ্য কবিরা মরিয়া হয়ে কাঞ্চনমূল্য বা তৈলমর্দনেও উৎসাহী, প্রকাশকও মহাকালের তুলনায় ইহকাল, ক্ষমতা বা রৌপ্য-আশ্বাসে অধিক আস্থাশীল। এক সাম্প্রতিক কবি, যিনি নিজে বর্ধিষ্ণু প্রকাশকও, নিজের একটি কাব্যগ্রন্থের নাম দেন, *তরুণ কবি প্রথম বই*। এ কি প্রকাশনা জগতের প্রতি কোনো সুপ্ত কটাক্ষ?

নতুন যুগের ভোরে, নতুন-নতুন সমস্যাও আবির্ভূত হচ্ছে। দশকওয়ারি বিভাজনের জাঁতাকলে অনেক কবি দ্রুত হিসেবখাতায় নাম ওঠাতে ব্যস্ত! (প্রশ্ন হল, নজরুল কোন দশকের, সত্যেন্দ্রনাথ অথবা যতীন সেনগুপ্ত কিংবা অক্ষয় বড়াল? রবীন্দ্রনাথকে না-হয় দূরেই রাখলাম।) প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রকাশসন অনুযায়ী কবিরা দশক-টাওয়ারে ঘর পাবেন। এই তথ্যে বিচলিত কবি-কুল শব্দচর্চায় অর্থভাণ্ডারকে যোগ করে দেন। পরিকল্পনা, সম্পাদনা বা নির্বাচনের দিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নেমে পড়েন মুদ্রণ-উন্মত্ততায়। ভুলে যান যে, প্রথম গ্রন্থ বা সাধারণভাবে গ্রন্থাবয়ব আসলে এক স্থায়ী নথি। ইতিহাসের চিত্রগুপ্ত-খাতা যা তুলে নেয় তাকে গুপ্ত-লুপ্ত করা অসম্ভব। অনুমান করি, জীবনানন্দ পরিণত বয়সে *ঝরা-পালক* নিয়ে সম্ভবত বিব্রত বোধ করতেন। তাঁর কি কোনো তাড়া ছিল? তারাপদ রায় তো স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেই বসেন, '...আমার প্রথম বই বহু কষ্টে, বহু ভালোবেসে ছাপিয়েছিলাম, আজ এতদিন পরে তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমার দ্বিধা অসীম।' গোলমাল আরও আছে। এক মেধাবী ছাত্রবন্ধু, অয়ন, দশক বিভাজনের অঙ্ক বিষয়ে বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলে আমাকে কুপোকাত করে দেন। তিনি বলেন, জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ১৯২৯, কবিরুল ইসলামের ১৯৬৭, সুবোধ সরকারের ১৯৮০, মণীন্দ্র গুপ্তের ১৯৬৯ সালে। এবার, কে কোন দশকের কবি? সিদ্ধেশ্বর সেন? তাঁর প্রথম বই বের হল তো প্রায় আটের দশকে!

৪

'এক মুঠো রোদ-এর কবিতাগুলো ছিল তখনকার গড়পড়তা রাজনৈতিক ছাঁচে ঢালাই করা। আমার নিজস্ব কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট, অনতিস্ফুট। তখন মনে হয়েছিল, এ বুঝি বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এক অমর কীর্তিস্তম্ভ। সময় কান ধরে দেখিয়ে দিয়েছে, স্তম্ভ নয় স্তম্ভের পায়ের তলাকার ধুলোবালি। তবুও, প্রথম প্রেম, প্রথম কবিতার বই, চাকরির প্রথম মাসের মাইনে, প্রথম প্লেনে চাপা, এইরকম কিছু কিছু প্রথম আছে, যার স্বাদ জীবনের গায়ে আমরণ এঁটে থাকে টিকে-র চাকতি দাগের মতো।' — লিখেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। আধুনিক কবিদের মনের কথা মিশে আছে শেষ বাক্যগুলির পরতে-পরতে। তবে, প্রথম কাব্যগ্রন্থ নিয়ে এতসব আবেগ-উৎসাহ, উদ্দীপনা-অনুযোগ সম্ভবত বাঙালি কবিদের একচেটিয়া (নাকি বলব, ভারতীয় কবিদের?)। বিদেশি কবিদের সাক্ষাৎকার বা আত্মকাব্যজীবনীতে প্রথম পর্বের বা সূচনা যুগের কবিতাপ্রবণতা নিয়ে কথাবার্তা নজরে এলেও, প্রথম কাব্যগ্রন্থ নিয়ে এত বিস্তারিত উদ্ভাস চোখে পড়েনি। *দেশ* সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৯ এবং ১৩৮৭ খুললেই চোখে পড়বে এগারো আর যোলো, মোট, সাতাশজন কবি কীভাবে আলোড়িত হয়েছেন কবিতার অমলিন আশ্লেষে। সেখানে প্রথম কাব্যগ্রন্থ নিয়ে অধিকাংশেরই অপার উদ্‌বেল উন্মোচন!

৫

নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশক বিগতপ্রায়। তরুণ কবির চোখে যদি চতুর্দিকে তাকাই, খুব কি আশার আলো ঝিলিক মারে? মনে তো হয় না। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের প্রশ্রয় হাতে গোনা কয়েকজন প্রকাশকের কাছেই সীমাবদ্ধ। তাঁদেরও অনেকেই মেধার বদলে মূল্যে উৎসাহী। পত্রিকালগ্ন প্রকাশনীতে আবার রয়েছে গোষ্ঠীরাজনীতি বা ব্যক্তিপ্রসন্নতার জটিল পাটি(পার্টি?)গণিত। আরো দুশ্চিন্তার কথা, কলকাতাকেন্দ্রিকতাকে ঝড়ে-ফুৎকারে উড়িয়ে সদরশহর বা মফস্বলের প্রকাশনা, তারুণ্যদৃপ্ত প্রকাশনী আজও বাস্তবায়িত হল না। সবচেয়ে বড়ো কথা, বাংলা কবিতা পড়ার লোক সবযুগেই অত্যল্প ছিল, এখন বাংলা পড়ার লোকই শহর কলকাতার চৌহদ্দিতে ক্রমশ কমছে, এমনকী বাংলা কবিতা লেখার লোকও। এমতাবস্থায়...

তবু আশা মরে না। গ্রেনেডের মতো পাণ্ডুলিপি হাতে, মনে হয়, ঘুরে বেড়াচ্ছে একাধিক কবি, এ-সময়ের প্রেম আর নৈঃশব্দ্য, ক্রিসমাস আর শীত, তার জলপাইকাঠের এসরাজে বাজাতে-বাজাতে উতল নির্জনে করছে পদচারণা, ক্রমে অতিকায় হবে ওদের ছায়া, ভেঙে যাবে যা কিছু অভ্যাস, যা কিছু গড্ডল প্রচলন...

প্রথম, অদ্বিতীয়

বরুণ চট্টোপাধ্যায়

কলম পিষতে হয় না যে লেখককে (A writer who does not write) তিনিই কবি। এভাবেই কবি ও অন্যান্য লেখক-সাহিত্যিকের স্বাতন্ত্র্যের সারাৎসার উচ্চারণ করেছিল জাঁ ককতোর 'অরফিউস'। গোটা *অরফি* ছবিতে ব্যক্তিগত পবিত্রতায় একলষেঁড়ে অনড় অরফিউসকে পুরাণভুবন থেকে প্যারিসের নাগরালিতে নামিয়ে এনেছিলেন ককতো। নিজের জন্য এমন এক দাসানুদাস মুখপাত্র দরকার ছিল তাঁর, যার মধ্যে আছে এক চাঁদসওদাগরি স্বাধীনতা। সিনেমার প্রোজেকশনের আলোকছাপ যদি আড়ে-দীঘে-বেধে-কালে প্রায় অপরিমেয়র কাছাকাছি বেড়ে যায় তাহলে অরফিউস-কথিত কবির ওই সংজ্ঞার মধ্যে কোথাও আশ্রয় পেতে পারে অতিপরিচিতির ফাঁদে অবিরত আপ্রাণ ডানা-ঝাপটানো জীবনানন্দ-ভৈরবী বন্দিশ — 'সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি।' কবির চারপাশে পৃথিবীকে গুটিয়ে এনে যদি তাকে জনতার অনুষঙ্গহীন একক করে নেওয়া যায়, তা বিবিক্তির ষড়যন্ত্র বলে গণ্য হবে না — তার সম্ভাব্য উপমা হয়তো দুর্ভেদ্য কবচ-কুণ্ডল — বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা। এই প্রজ্ঞাপারমিত এককত্ব থেকেই কবি অনায়াসে স্পর্শ করেন মহাবিশ্ব-মহাকাশের ত্রিপাদভূমি। স্পর্শ। সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তম্ভন — পঞ্চশরের পাঁচটিই কনভার্জড এই অনুভূতির মধ্যে। একটি পানু বইতে প্রবন্ধগোত্রীয় এক রচনায় পেয়েছিলাম বড়ো আশ্চর্য উপসংহার : 'স্পর্শের এমনি গুণ। যেকোনো আজন্ম ব্রহ্মচারী লোকও যদি কোনো সুন্দরী নারীকে স্পর্শ করে তবে তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠতে পারে।

ঋষি মনু একজায়গায় বলেছেন : (পানু বই-এর উদ্ধৃতিটিই চলছে এখনও)

মাতা, শ্বশ্রা, দুহিত্রা বা ন বিভিক্তাল, নো ভবেৎ
বলবান ইন্দ্রিয়গামী বিদ্ধবং সমাপি কর্ষতি।

অর্থাৎ একান্তে মা-বোন এমনকী দুহিতার সঙ্গে পর্যন্ত কথা বলা উচিত নয়, তাতে বলবান ইন্দ্রিয়গুলি মানুষকে বিপথগামী করতে পারে।'

পানুর উদ্ধৃতি এইখানে শেষ। দেবভাষার ব্যাকরণশুদ্ধির চেষ্টা এই প্রসঙ্গে রসাস্বাদন ভণ্ডুল করে দিতে পারে, অন্যথায় পণ্ডিতের শরণাপন্ন হতাম। পানুর এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির মধ্যে থাকতেই পারত কয়েকটি সরেস অপশব্দ। তেমন কিছু নেই। অতএব ব্যালান্স করার জন্য একটু কানকি মেরে বলছি — কবির যদিও বা ঈষৎ থাকে, কবিতার কিন্তু কোনোমতেই মা-মাসি জ্ঞান বা সংস্কার নেই। সে সর্বগ্রাসী। মা-মাসি-বাপ-ভাই-সপ্তসিন্ধুদশদিগন্তত্রিভুবন গিলে খেতে পারে। ককতো এই কারণেই (হয়তো) কবিকে লেখক থেকে আলাদা করে দিচ্ছেন — শুধু অরফিউসের মধ্যস্থতায় নয় — নিজের লেখা (বলা বাহুল্য, কবি হিসেবে নয়) *The Difficulty of Being* বই-এর একাংশে তিনি বলছেন : 'When the artist is a poet, he must write, paint, sculpt, photograph and cinematograph all at once in his writing'। কবির এই বিপুল ক্ষুধায় বিশ্বাসী বলেই হয়তো রোঁয়া-ওঠা কৈশোরে, মাত্র আঠারোয়, ককতো প্রকাশ করছেন তাঁর প্রথম কবিতার বই *আলাদিনের চিরাগ*। স্পর্শ, এক লহমার স্পর্শে যা থেকে জেগে ওঠে গুটি-সুটি মারা দৈত্য-অবতার — স্পর্শকের ইচ্ছাই যার কাছে আদেশ — আদেশমাত্র যে এনে দিতে পারে শূন্য থেকে পূর্ণ — সব — সবকিছু।

শুধু ককতোর নয় — সমস্ত প্রথম কবিতার বই-এই নামের তলায় অদৃশ্য সাবটাইটেলে লেখা থাকে, যেকোনো কবির যেকোনো যুগের, যেকোনো যুগের যেকোনো প্রথম কবিতার বই-এর প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র বৈধ নাম — 'আলাদিনের চিরাগ'। প্রথম কবিতার বই-এর কাগজ নেই, কালি নেই, বাঁধাই নেই, মলাট নেই, বিজ্ঞপ্তি নেই, মূল্য নেই — অথচ এ সবই আছে এক অনাহত না-থাকার মোড়কে। প্রথম কবিতার বই-এর — কবির ও অকবির — একমাত্র উপকরণ অপরিমেয় স্পর্ধা — এই স্পর্ধাই কবিতার প্রথম বই-এর একমাত্র মহাওঙ্কার-ধ্বনি। কোনো লেখকের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস, প্রথম প্রবন্ধ বা নাটক বা গল্পসংকলন বহু ক্ষেত্রেই শুধু নামেই প্রথম — কিন্তু ক্রমানুসারে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা... যায় আসে না কততম। কবির প্রথম বই নিয়ে লিখতে নেমে দেখি উঠোন বাঁকা। একেবারে লেবড়ে গেছি ঈশ্বর। যদিও সম্পাদকই একমাত্র গ্রাহ্য পরমতা — তবু পারলাম না। 'কবির প্রথম বই' বললে তো 'প্রথম' শব্দটাই প্রথমে থাকে না। 'কবিতার প্রথম বই'-তেও একই সমস্যা। সেখানেও 'প্রথম' হয়ে গেছে দ্বিতীয়। যার আনারকলি করার কথা, তাকে দিয়ে কি আর যোধাবাঈ করানো যায়?

'প্রথম সবকিছু' — এই দু-টি শব্দে ক্রম বা সিকুয়েন্স উলটে দিলে পালটে যা দাঁড়ায় (যদি আদৌ দাঁড়ায়!), তা হল — 'সবকিছু প্রথম'। 'সবকিছু প্রথম' এই সিনট্যাক্স-এর কোনো অর্থ হয়? অর্থ না হোক — অস্তিত্ব তো হয়ই। এই হওয়াটাও তো হওয়া, তাছাড়া অর্থ হয় না, একথাই বা ভাবব কেন?

অতএব শিরোনাম বা বলা ভালো প্রস্তাবিত বিষয়টি একটু যাকে বলে শাফ্‌ল করে নিলাম। প্রথম কবিতার বই — এই শব্দত্রয়ী সমন্বিত বাক্যাংশের অর্থ এক-একটি শব্দের ওপর ঝোঁক বা স্ট্রেস দিয়ে স্ক্যান করলে একেকরকম অর্থ পাওয়া যায়। **প্রথম** কবিতার বই : (কোনো লেখকের) অন্যান্য বিষয়ের বই-ও আছে — এই প্রথম 'কবিতার বই'। প্রথম কবিতার **বই** : এই প্রথম কবিতা বই হয়ে প্রকাশিত বা মুদ্রিত, লিখিতও হতে পারে। এই ঝোঁক বা স্ট্রেস অনুযায়ী আর-একটি অর্থ সম্ভাবনাও আছে — একাধিক প্রথম কবিতার অর্থাৎ বিভিন্ন লেখকের (সচেতনভাবেই 'কবি' না বলে 'লেখক' বলছি) প্রথম বলে বিবেচিত বা স্বীকৃত কবিতাগুলির সংকলনবিশেষ। যত বড়ো তালেবরই হোন, দু-টি বা একাধিক প্রথম কবিতা কেউই লিখতে পারেন না। উক্ত শব্দত্রয়ীর যে অর্থটি সবচেয়ে জটিল তা বোধহয় পাওয়া যাবে 'কবিতা' শব্দটিতে ঝোঁক দিলে; অর্থাৎ বাক্যাংশটি যদি এইভাবে প্রতিভাত হয় — প্রথম **কবিতার** বই। এই তৃতীয় অর্থ সম্ভাবনাটিকেই ঈষৎ বিশদে বোঝার চেষ্টা করব।

প্রথম **কবিতার** বই। অন্য কিছু নয় — শুধু কবিতার — কবিতারই, অন্য কিছুর নয়। 'প্রথম' শব্দটি বিশেষণ — অনেককিছুরই 'প্রথম' হয় — প্রথম হতে পারে প্রায় সবকিছুরই। বই — তার প্রত্নমূল্য সত্যমূল্য তথ্যমূল্য সাহিত্যমূল্য যাই হোক — আসলে 'বই' একটি অবজেক্ট বৈ তো অন্য কিছু নয়। (আইডিয়া 'বই' নামক অবজেক্টটিতে আশ্রয় নেওয়ার পর তাকে 'বই' বলে চিহ্নিত করা হয় বাজারজাত হওয়ার পর।) কিন্তু কবিতা? তার রহস্য প্রায় 'প্রাণ' বা 'লাইফ'-এর মতোই অচিন্ত্য। প্রাণ সম্পর্কে তবু একটি সংজ্ঞায় অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতৈক্য পাওয়া গেছে — 'Life is a biochemical process'। কেউ-কেউ আর একটু রহস্য করে বলতে পারেন, প্রাণ বা লাইফ হল প্রগাঢ়তম যৌনরোগ — Sexually Transmitted Disease। কবিতা সম্পর্কে কিন্তু পণ্ডিত, মূর্খ, প্রতারক, ভাঁড়, রাষ্ট্রনায়ক, ঘাতক কারো দেওয়া কোনো সংজ্ঞাই ধোপে টেকেনি। সেন্ট অগাস্টিন-এর বিখ্যাত রসিকতাটিতে এই বহুমত-রহস্যেরই দ্যোতনা আছে। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কবিতা কী, রসিক সাধুবাবা বলেছিলেন — সে বড়ো ঝক্কি! আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো, কবিতা কী, তাহলে বাপু আমি কোনো জবাব দেব না। তবে আমি আমার মতো করে বেশ জানি, কবিতা কারে কয়।

এই 'আমার মতো করে'-তেই যত বিপত্তি। তাই হয়তো ককতোর অরফিউস কবি সম্পর্কে বলে — 'A writer who does not write'।

কিন্তু বিষয় যখন প্রথম কবিতার বই তখন অরফিউসের কথায় কান দিলে চলবে না। যদিও কথায় কান দেওয়া না-দেওয়াই রয়ে গেছে অরফিউসের অপার ট্র্যাজেডির মূলে। তার মাতা স্বয়ং ক্যালিওপে — অন্যতম প্রধান মিউস — কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, হোমার-এর জীবনদেবতা। পিতা ওয়েগ্রুস (মতান্তরে স্বয়ং দেব অ্যাপোলো), সুরার অধীশ্বর। প্রিয়া এউরিদিচিকে সাবিত্রীর মতো মৃত্যুর অবনরক থেকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল অরফিউস। শর্ত ছিল, কোনো পিছুডাকে সাড়া দিয়ে পিছু ফিরলেই চিরতরে অপার নাস্তিতে বিলীন হবে তার

প্রিয়া। পিছুডাকে সাড়া দিয়েছিল অরফিউস। ককতো হয়তো এই আখ্যান-দ্যোতনার জন্যই মিথপুরুষ অরফিউসকে কবির আত্মা করে তুলেছিলেন তাঁর বিশ্রুত চলচ্ছবিতে। যে কবি — কিন্তু লেখে না। লেখে না মানে এই নয় যে সে লেখেনি কখনো। লিখেছে যত, নষ্ট করেছে তার বেশি। নষ্ট করা মানে শুধু পাতা ছেঁড়া নয়, তা তো ছিঁড়তে হয়েছেই। নিজের কবিতা আত্মার গভীরে যখন রূপ নিতে চেয়েছে — অরফিউস, কবি, সেই আত্মাকে আহত করে ভ্রূণহত্যার নির্মমতায় নষ্ট করেছে বহু প্রকাশিত হতে চাওয়া কবিতা। কিন্তু এরপরও তো কোনো না কোনোদিন প্রকাশিত হবেই তার প্রথম কবিতার বই। যতই চেষ্টা করুক অরফিউস অপ্রকাশের অহঙ্কারে মগ্ন থাকার — প্রতিষ্ঠা ও আত্মপরিচয়ের আকর্ষণে ক্ষণিক থেমে কখনো হঠাৎ একদিন মনে হবে এবার প্রকাশ করা যেতে পারে প্রথম কবিতার বই। কিন্তু পিছন ফেরার পরই যেমন হারিয়েছিল পরানপ্রিয়াকে — তেমনি নিজের কবিতা বই-এর আকারে প্রথমবার বাজারজাত করার পর কী অনুভূতি হয় কবির? সে এক অপরূপ রহস্যময় মিশ্র সংবেদন। প্রথম সন্তানের জন্ম দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সব প্রসূতিরই তো মনে পড়ে প্রথম কৌমারহরণের কথা — সে সন্তান কাম্য পুরুষেরই হোক, হোক ধর্ষকের, হোক অসহায়তার কৌন্তেয় — সন্তান বড়ো বিষম বস্তু। কবিতার বই প্রথমবার প্রকাশের পর কী ভাবেন কবি? কোন কবি কী ভেবেছেন, তা নিয়ে সম্পাদিত সংকলন বা তালিকা প্রস্তুত হতে পারে — কিন্তু এই প্রশ্নের বৈধতার মধ্যে যে নিত্য সত্য আছে, তা অধরাই থেকে যায়। আর যদি ধরে নিই নিত্যতা বলে কিছু হয় না, হতে পারে না — অনিত্যতাই সারসত্য — তবু কবি তব মনোভূমি কী উত্তর দেয় প্রথম কবিতার বই প্রকাশের পর!

এই মনোভূমি-সূত্রে হয়তো কবি নয় এমন 'সকল'-এর অর্থাৎ 'প্রাকৃতজন'-এর প্রথম সবকিছুর মধ্যে কয়েকটির ঈষৎ ম্লান আলেখ্যকেও প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। প্রথমের একটি অনিবার্য অর্থ যদি অদ্বিতীয় বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে প্রতি জীবনেই বেশ কিছু 'অদ্বিতীয়' আছে। প্রত্যেকের জন্ম মাত্র একবার, মৃত্যুও একবার মাত্র, আর জন্মমৃত্যুর মধ্যেও কিছু 'প্রথম' প্রকাশ একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। 'প্রথম স্কুলে যাবার দিন' ব্যাপারটি বললে প্রাকৃতজনের পরিসর বোধহয় বড়ো সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। শ্রেণিচেতনার আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায়। জীবন ব্যতীত অন্য কোনো পাঠশালায়, এমনকী প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালাতেও অনেকের যাওয়া হয়ে ওঠে না। কিন্তু হাওড়া থেকে না-হোক — কাশবনের অযান্ত্রিক চৌম্বকক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অনেকেই দেখতে পায় অজ্ঞাত উৎস থেকে অজানা গন্তব্যে ছুটে যাওয়া ছেলেবেলার রেল। বিস্ফার ঘটে চেতনার। জীবন থাকতেই দেখতে হয় কোনো মৃত্যু, প্রথমবার। প্রথম দেখা মৃত্যুর অভিঘাতে কেউ ঈষৎ এগিয়ে যায় বোধির পথে, আবার *সমাপ্তি*-র মৃন্ময়ীর মতো (সত্যজিতের মৃন্ময়ী, রবীন্দ্রনাথের নয়) প্রিয় পোষা পাখিকে মরে কাঠ হয়ে যেতে দেখেও কেউ-কেউ কেঁপে ওঠে যৌবনসন্তাপে; অথবা প্রথম যৌবনসন্তাপে, মরে কাঠ পোষা পাখি দেখেও মৃত্যুকে উপেক্ষা করে কেউ!

এই এক প্রথম। শরীরে রসসঞ্চার। প্রথম রক্তস্রাব। আতঙ্ক দৃশ্যত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রহস্য। দাশুর বাক্স যে-বয়সে সকলকে অপদস্থ করে সেই বয়সেই আবার হঠাৎ কোনো অনাহুত ওড়নার আভাসে নেচে ওঠে স্ফিংকটার পেশি, হাফপ্যান্টে স্থান অকুলান — সেই ভর, আয়তন আর ঘনত্বের এক জৈব সংস্কার। কেউ তালিম দেয় না — পূর্বপুরুষেরা দাওয়ায় বসে গল্প করতে-করতে প্রত্নজ্ঞানের বুদ্‌বুদ ভাসিয়ে দেয় — আর ভুট্টা খুঁজে পায় কবিত্ব। অবশ্যই কোনো না কোনো একবার প্রথম। গুন্টার গ্রাসের *টিনড্রাম*-এর বালক অস্কার গর্ভসোপান দিয়ে বেরোতে-বেরোতে দুনিয়ার প্রথম উদ্ভাস দ্যাখে ষাট ওয়াটের আলোয়। আবার প্রথম প্রসবের পর কোনো কুন্তী অদ্বিতীয় অসহায়তায় প্রথম ভাসিয়ে দেয় কোনো কর্ণকে, এমনই কোনো নাজায়েজ কলকাতার জিসু হয়ে উঠে প্রথম থামিয়ে দেয় প্রমত্ত ট্রাফিক। আমরা একটা বয়স পর্যন্ত এঁচোড়ে-পাকা থাকলেও এক বন্ধু ছিল জন্মসিদ্ধ কাঁঠাল, পোঁদ ছাড়াও মাথা থেকে পা সর্বাঙ্গ যথার্থ পেকেছিল তার। যেসব দিব্যজ্ঞানের গল্প সে বলত, তার মধ্যে একটি ছিল ষষ্ঠ বেদের ঋকবিশেষ। প্রথম গোল দেবার পর নাকি তার প্রথমবার বীর্যপাত হয়ে যায় (অবশ্য এর পরও ওই অভুবনীয় আর্দ্র প্যান্ট পরেই সে রেফারির শেষ বাঁশি পর্যন্ত মাঠে ছিল)। এভাবে স্বকীয়া-পরকীয়া নানান কবিতা বৈধী বা রাগানুগা বিভাবে আকীর্ণ করে থাকে আমাদের মন — ওই মনোভূমি — আলাদিনের চিরাগ।

আলাদিনের চিরাগের একটি কাহিনি বা প্রচলিত কাহিনির একটি ভিন্নতর পাঠ পেয়েছিলাম এক মিশরীয় উপকথায়। চিরাগ ঘষলেই দৈত্য বা জিন বেরিয়ে আসবে বটে, তালিম করবে সমস্ত হুকুম। কিন্তু চিরাগের মালিককেও মূল্য দিতে হবে। যতবার প্রদীপ ঘষা হবে চন্দ্রকলার মতো ক্ষয় হবে তার আয়ু। কিন্তু ইচ্ছাপূরণের আকুলতায় সে বারবার ঘষবে চিরাগ — প্রতিবার ইচ্ছাপূরণ করবে দৈত্য। আর প্রতিবার আলাদিন দেখবে সে বস্তুত তার প্রকৃত ইচ্ছার স্বরূপই জানে না। স্বরূপসন্ধানের অমোঘ টানে আত্মঘাতী হয়ে উঠতে হবে আলাদিনকে। প্রতিবার আয়ুক্ষয় হচ্ছে জেনেও ঘষতে হবে চিরাগ। সিসিফাস নরকে বসে দেখবে কবিবন্ধুর লীলা। যে ককতো ভেবেছিলেন, প্রকৃত কবি কখনো লেখক নয়, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ (যদিও স্বয়ং ককতোর স্বীকৃত কাব্য-তালিকায় উপেক্ষিতা) *আলাদিনের চিরাগ*-এর মধ্যে কি কবির এই প্রথম বাণিজ্যিক আত্মপ্রকাশের আত্মঘাতী মোহঅঞ্জন লেগে নেই কোথাও? লেগে নেই প্রকাশিত সমস্ত প্রথম কবিতার বই-এর প্রচ্ছদেরও আগের অদৃশ্য পাতাটিতে?

প্রথম কবিতার বই : গল্পকথা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ও পাঠকের চাহিদার সমীকরণ

সোমব্রত সরকার

> সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তী আমার সমস্ত কবিতা কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি। যদি সুযোগ পাইতাম তবে সন্ধ্যাসংগীতকেও বাদ দিতাম। কিন্তু সকল জিনিসেরই একটা আরম্ভ তো আছেই। সে আরম্ভ কাঁচা এবং দুর্বল, কিন্তু সম্পূর্ণতার খাতিরে তাহাকেও স্থান দিতে হয়।
>
> সন্ধ্যাসংগীত হইতেই আমার কাব্যস্রোত ক্ষীণভাবে শুরু হইয়াছে। এইখান হইতেই আমার লেখা নিজের পথ ধরিয়াছে। পথ যে তৈরি ছিল তাহা নহে —গতিবেগে আপনি পথ তৈরি হইয়া উঠিয়াছে। তখন শক্তি অল্প, বাধা বিস্তর, নিজের কাব্যরূপকে তখনো স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই নাই, ভালোমন্দ বিচার করিবার কোনো আদর্শ মনের মধ্যে ছিল না। তাহা ছাড়া, প্রথম রচনার সকলের চেয়ে মস্ত দোষ এই যে তাহার মধ্যে সত্যের অভাব থাকে। কেননা সত্যকে মানুষ ক্রমে ক্রমে পায় — অথচ সত্যকে পাইবার পূর্বেই তাহার কর্ম আরম্ভ হইয়া থাকে; সেই কর্মের মধ্যে আবর্জনার ভাগই বেশি থাকে।
>
> মানুষের জীবন তাহার প্রতিদিনের আবর্জনা প্রতিদিন মোচন করিয়া তাহা মার্জনা করিয়া চলে। যুবা আপনার শৈশবের হামাগুড়িকে জমাইয়া রাখে না। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্য ভাণ্ডারে আবর্জনাগুলোকে একেবারে দূর করিয়া দেওয়া যায় না। যাহা একবার প্রকাশ হইয়াছে তাহাকে বিদায় করা কঠিন।
>
> অতএব সন্ধ্যাসংগীতকে দিয়া কাব্যগ্রন্থাবলী আরম্ভ করা হইল। ইহার কবিতাগুলির মধ্যে কবির লজ্জার কারণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু যদি তাহার পরবর্তী রচনায় কোনো গৌরবের বিষয় থাকে তবে এই প্রথম প্রয়াসের নিকট সেজন্য ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে।

১৯১৫ সালে যখন মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় *ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস* থেকে রবীন্দ্রনাথের *কাব্যগ্রন্থ প্রথমখণ্ড* প্রকাশ পেয়েছিল, তার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ *সন্ধ্যাসংগীত*-কে বাদ না-দেবার যুক্তিস্বরূপ উক্ত কথাগুলো লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকাশিত প্রথম কবিতার বই *কবিকাহিনী*-কে বাদ দিয়ে, *বন-ফুল*, *ভগ্নহৃদয়*,

রুদ্রচণ্ড, কালমৃগয়া, বিবিধ প্রসঙ্গ, নলিনী এবং *শৈশবসংগীত*-কে বিতাড়িত করে সন্ধ্যাসংগীত হতেই সৃষ্টিস্রোতের বা বলা ভালো, প্রথম সৃষ্টিস্রোতের জরিপ-যাচাই ভূমি হিসাবে দেখতে শুরু করেছিলেন; আর সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি দেখি, তাহলে *সন্ধ্যাসংগীত*-ই ছিল তাঁর প্রথম উদ্দীপনের যুক্তিজাগর অধ্যায়। তাকে কোনো কবিই কখনো কোনোভাবে অস্বীকার করতে পারেন না। পারেননি তার ঠিক তিন বছর আগে ১৯১২ সালে প্রকাশিত *জীবনস্মৃতি*-তেও *সন্ধ্যাসংগীত*-এর প্রসঙ্গ বাদ দিতে। *সন্ধ্যাসংগীত* তো বটেই *কবিকাহিনী*-র প্রসঙ্গও ছিল সেখানে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *কবিকাহিনী*-র কথা কুণ্ঠা সহকারে হলেও প্রকাশ করেছিলেন। আজ এই লেখা লিখতে গিয়ে ভীষণই ভাবতে ইচ্ছে করছে, ১৮৭৮ সালের ৫ নভেম্বর তিপান্ন পাতার যে *কবিকাহিনী* প্রকাশ পায়, খানিকটা তাঁর অজ্ঞাতসারে বন্ধুবর প্রকাশক প্রবোধচন্দ্র ঘোষের বদান্যতায়, সেই গ্রন্থ তিনি হাতে পেয়েছিলেন বিলেতে বসেই, হাতে পেয়ে রবীন্দ্রনাথের মুখের রঙে কীরকম আনন্দ লেগেছিল! আনন্দ তো নিশ্চয়ই ছিল কবির মুখাবয়বে। তাকে যদি বাদও দিই তবু রবীন্দ্রযুক্তির প্রথম প্রয়াস *সন্ধ্যাসংগীত*-কেই সামনে আনি, সেই রবীন্দ্রমতের প্রথম প্রয়াসের প্রখর উপসর্গকেও তিনি যে বাদ দিতে পারেননি তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ১৯১৫ সালে সংকলনে বিভাবের প্রস্তরে আপাতসংযোগ একটা রেখা টেনে দিয়েছিলেন। যার নিমেষে সৃষ্টিজীবনের সাদর সুন্দরের অভ্যর্থনা বা সংবর্ধনা যা-ই বলি না কেন, কথার প্যাঁচে আক্ষরিক অর্থেই সেজে বসেছিল। আর সেই সাজ যেকোনো কবিরই প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে ঢুকে পড়ার সাজ কবিতার বই-এর ঋজুরৈখিক পর-পর একাগ্র ধারাবাহিকতায়। তার তানভ মূর্ছনায় অসুরের অশ্রুবিন্দু নিয়ে এই এখনই কিন্তু আলোচনা করতে চাইছি না। বরং প্রথম কবিতার বই-এর হাসি-কান্না-অশ্রু-ঘাম-রক্তের সেই প্রাণপরিসরকেই এখানে দেখে নিতে চাইছি কবির দ্বিধান্বিত বিবেচনায়, কখনো বা পাঠকেরই নানা সব প্রতিপ্রক্রিয়ায়। বাংলা ভাষায় প্রধান কবির প্রথম কবিতার বই-এর নির্জিত প্রতিনিধির স্বরটিতে এখানে দেখা গেল উদ্দীপনের ধুলোগন্ধের রণনেও ঝুল-কালি উলটানো দোয়াতের পরিসরে ঋণে ওতপ্রোত হয়ে আছে অগ্রস্মৃতি ও পুনরাবর্তের পরস্পরস্পর্শিতা।

মান্য আধুনিকতার দুন্দুভি যার হাতে সর্বপ্রথম জোরে বেজেছিল বলে আমরা অনেকেই মনে করি, সেই জীবনানন্দের প্রথম কবিতার বই *ঝরা-পালক* (১৯২৭)-এ রবীন্দ্রপ্রবাহকে অস্বীকারের চেষ্টা ছিল ঠিকই, কিন্তু প্রভাব ছিল তাঁরই ধার ঘেঁষে লিখতে আসা কবি কাজি নজরুলের। নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অগ্নিবীণা* বেরোয় ১৯২২ সালে, আর ১৯৩০-এ তাঁর আঠেরোটি কাব্যগ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যের আকাশে আলো ছড়াচ্ছে একেবারে জ্বল-জ্বল করে অতি প্রখরতায়। শেষ পর্যায়ের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়ে অনেকটাই চাপা পড়ে গিয়েছিলেন নজরুলের উদাত্ত স্বরে। জীবনানন্দের মানস-চেতনে বাংলা ভাষার প্রধান কবির ভাষাকে অতিক্রম করে শৈলী পরিবর্তনের একটা চেষ্টা ভেতরে-ভেতরে ছিলই। সেটা করতে গিয়েই তিনি অজ্ঞাতসারে নজরুলের সমসাময়িক সেই উদাত্ত আকাশকে ছুঁয়ে দিয়েছিলেন। 'মদের পাত্র গিয়াছে কবে যে ভেঙে! / আজো মন ওঠে রেঙে / দিল্‌দারদের দরাজ গলার রবে, / সরায়ের উৎসবে! / কোন্ কিশোরীর চুড়ির মতন হয়ে / পেয়ালা তাদের থেকে থেকে বেজে যায় / বেহুঁশ হাওয়ার বুকে!' পড়লে মনে হয়, এ যেন নজরুলেরই লেখা। তবে এটাও ঠিক, *ঝরা-পালক* বইতেই আমরা প্রথম ও শেষবারের জন্য পেয়েছিলাম অপরিণত জীবনানন্দকে। রবীন্দ্রনাথের *সন্ধ্যাসংগীত*-এও তাঁর গুরুদেব, মাস্টারমশাই *সারদামঙ্গল*-এর কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রভাব ছিলই। রবীন্দ্রনাথ তা নিজমুখেই স্বীকার করে গেছেন কিন্তু *জীবনস্মৃতি*-তে। অপরদিকে জীবনানন্দের নজরুলের প্রভাব-স্বীকৃতির কোনো ভাষা তো আমরা অদ্যাবধি পাইনি। যতটা এখন পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত কলাকুশলতা। এ বিষয়ে ভূমেন্দ্র গুহ যথেষ্ট ভালো বলতে পারবেন। যেটা মনে হয়, জীবনানন্দ ঠিকই বোধহয় বুঝেছিলেন প্রধান কবিকে ডিঙোতে গিয়ে তিনি প্রায় সাময়িক খ্যাতিমান কবির ভাষাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ছেন। তাই চুপিসারে তৈরি হয়ে সরে এসেছিলেন। পরবর্তীর ইতিহাস আমরা জানি। সেদিকে আর যাচ্ছি না। তবে আমরা ব্যক্তিগত ধারণা, জীবনানন্দের ভয় ছিল যদি *বনলতা সেন*-এর খ্যাতির পরও তিনি প্রথম গ্রন্থের নজরুল-প্রভাবকে ঋণস্বরূপও সামনে আনেন — যা অনেকটাই আসলে সেই সময়প্রবাহের ঋণ, তবুও পাঠক বিরূপ হবেন। কারণ জীবনানন্দের মুখচোরা স্বভাবের জন্য তো তাঁর পাঠকদের সঙ্গে কোনোভাবে কোনোরকম কখনো যোগাযোগ ছিল না একেবারে। আর জীবনানন্দ তো এক অর্থে স্বল্প আয়ুর কবি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রায় শেষভাগে গ্রথিত কাব্যসংকলনে প্রথম কবিতার বইকে বাদ দেবার স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন। জীবনানন্দ অতখানি সময় পেয়েছিলেন কি? সমসময়ে সমসাময়িকদের নীরবতাই তাঁর প্রাপ্য ছিল। বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্যই কেবল সে-সময়ে তাঁকে সঠিক মর্যাদাটি দিয়েছিলেন। আসলে এই দুইজন মানুষেরই সেই প্রাজ্ঞতা, অসীমতা ছিল ভাষাপ্রবাহের বিরাট বদলের অভিঘাতকে সহ্য করবার। বুদ্ধদেব বসু তাঁর নিজের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ভাষা কিন্তু পেয়েছিলেন বেশ পরেই। ১৯৩০ সালে প্রথম প্রকাশিত কবিতার বইতে (*বন্দীর বন্দনা ও অন্যান্য কবিতা*) রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে গিয়ে বলা ভালো, রবীন্দ্রভূতই চেপে বসেছিল অনেকখানি। কারণ হল, তিনি বেশিমাত্রাতেই আসলে রাবীন্দ্রিক আচ্ছন্ন ছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই প্রবল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহচর্যে। তাই মুক্ত হতে তাঁর সময় লেগেছিল। আরও দশটি বই পেরিয়ে ১৯৫৮-তে *যে আঁধার আলোর অধিক*-এ তিনি লিখতে পেরেছিলেন — 'শুধু তা-ই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত। গভীর সন্ধ্যায় / নরম, আচ্ছন্ন আলো; হলদে-ম্লান বইয়ের পাতার / লুকোনো নক্ষত্র ঘিরে আকাশের মতো অন্ধকার; / অথবা অত্বর চিঠি, মধ্যরাতে লাজুক তন্দ্রায় / দূরের বন্ধুকে লেখা।' আর ততদিনে কিন্তু জীবনানন্দের মৃত্যুকাল চার বছর অতিবাহিত। অপরদিকে খেয়াল করার মতো বিষয়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য মুখে রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসবার কথা সেইভাবে না বললেও এক অর্থে গীতিকবিতা লিখেই রবীন্দ্রবলয়ে থেকে গিয়েও এক আলাদা রাস্তা তৈরি করে নিয়েছিলেন তাঁর প্রথম কবিতার বই *সাগর ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৩০)-তেই। আবার বু. ব-র অভিন্নহৃদয় বন্ধু অজিত দত্ত তাঁর প্রথম কবিতার বইতেই আলাদা ভাষাপথ আনতে পেরেছিলেন প্রবল রোমান্টিকতায়। সময়াবর্তকে দূরে ঠেলে এই কাজটি তিনি করেছিলেন তা-ও আবার সাধুভাষাতেই। আশ্চর্য! অজিত দত্তের *কুসুমের মাস* (১৯৩০) অদ্যাবধি জনপ্রিয় একটা বই। তাঁরই শতবর্ষে নতুন করে আবারও সেই বই ছেপে বের করলো *আনন্দ পাবলিশার্স*। *কুসুমের মাস* আর *বন্দীর বন্দনা* কিন্তু একসঙ্গেই প্রকাশিত হয়েছিল *ডি এম লাইব্রেরি* থেকে কাজি নজরুল ইসলামের অনুরোধে। *দেশ সাহিত্যসংখ্যা* ১৩৯৭-তে *কবিতা লেখার কথা* প্রবন্ধে অজিত দত্ত লিখছেন —

> ১৯৩০ সালে আমার কবিতার বই 'কুসুমের মাস' আর বুদ্ধদেবের বন্দীর বন্দনা একসঙ্গে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিল ডি এম লাইব্রেরি। আমাদের মতো তরুণ কবির কবিতার বই গোপালবাবু ছাপতে রাজি হয়েছিলেন, যতদূর মনে পড়ে, কাজী নজরুলের অনুরোধে। তখন নতুন প্রকাশক ডি এম লাইব্রেরি কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী' প্রভৃতি ছেপে কম লাভবান হচ্ছিল না। তাছাড়া নজরুল ইসলাম ও গোপালবাবুর মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। মানিকতলার মোড়ে ডি এম-এর ছোট্ট ঘরটিতে কাউন্টারের পিছনে মাদুর বিছিয়ে ওঁরা দু'জনে দাবা খেলতেন। গোপালবাবুর একটি গড়গড়াও থাকত। আমি সুযোগ পেলে কখনও দর্শকরূপে সে-খেলায় যোগ দিয়েছি। আমাদের কবিতার বই দু'খানি যখন ছাপা হয়, তখন আমি ঢাকাতে। সেটা আমার এম-এ-এর বছর। বুদ্ধদেবই কলকাতা এসে ছাপার সব ব্যবস্থা করেছিল এবং দুটি বইয়েরই প্রুফ দেখে দিয়েছিল। 'কুসুমের মাস' বাংলা দেশের কবিতা পাঠকেরা যে-অনুরাগের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তা আমার পক্ষে অপ্রত্যাশিত। বৃহত্তর পাঠকসমাজে যে এ বইয়ের এরূপ সমাদর হবে, তা আমার কাছে কল্পনাতীত ছিল।

বুদ্ধদেবের ভাবশিষ্য রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর প্রথম বই বেরোনোর গল্প শুনেছিলাম ওঁর মুখেই। *আরশি নগর*-এর পাণ্ডুলিপির সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর সুপারিশপত্র নিয়ে রমেন্দ্রকুমার হাজির হয়েছিলেন বিখ্যাত *মৌচাক*-এর দপ্তরে।

তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং সম্পাদকমশাই সুধীরচন্দ্র সরকার। তিনি রাশভারী গলায় তাঁকে জানান : আমাদের নির্বাচন কমিটি যদি এ-বই প্রকাশের যোগ্য বিবেচনা করেন — তবেই আমরা প্রকাশ করব। যথারীতি সে পাণ্ডুলিপি বু. ব-র সুপারিশ সত্ত্বেও অমনোনীত হয়। তখন তাঁর প্রিয় ছাত্র, এখনকার বলিষ্ঠ অনুবাদক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবিকে পরিচয় করিয়ে দেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যয়ের সঙ্গে। তিনি সম্মত হন *আরশি নগর* ছাপতে। শর্ত হয় একশো কপি বই-এর জন্য তাঁকে তিনশো টাকা দিতে হবে। ১৯৬১ সালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রকাশনায় বের হয় রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর প্রথম কবিতার বই *আরশি নগর*। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা আটচল্লিশ। দাম দু-টাকা। দুষ্প্রাপ্য সেই বই কবি স্বয়ং আমাকে উপহারস্বরূপ দিয়েছিলেন। আমার সৌভাগ্য এমন একটি বই আমার সংগ্রহে আছে। হোক না তা জরাজীর্ণ। পোকায় কাটা। তবু খ্যাতিমান শিল্পী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদপটটি এখনও যথেষ্টই নয়নাভিরাম। পরবর্তীতে এই বই নিয়ে কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে রমেন্দ্রকুমারের চিঠিচাপাটিও হয়েছে। সে এক মজার ঘটনা। সুনীলকে বিজ্ঞাপন বাবদ রমেন্দ্রকুমার অতিরিক্ত পঁচিশ টাকা দিয়েছিলেন। কথা ছিল বই-এর বিজ্ঞাপন বেরোবে *দেশ*-এ। এক সংখ্যা যায়, দু-সংখ্যা যায়, বিজ্ঞাপন আর বেরোয় না *আরশি নগর*-এর। রমেন্দ্রকুমার চিঠি লেখেন সুনীলকে। সুনীল অকপটে জানান বিজ্ঞাপনের পঁচিশ টাকা তিনি হজম করে ফেলেছেন বেমালুম। তাঁর তখন চাকরি-বাকরি নেই। বেকারজীবন। রমেন্দ্রকুমারও দমবার পাত্র নন। তিনিও চিঠি লেখেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে চাপে রাখার জন্য। ৫.১.৬৫-তে সে চিঠির একটা উত্তরও দেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব অকপট স্বীকারোক্তিতেই। পরবর্তীতে কথা প্রসঙ্গে রমেন্দ্রকুমার আমাকে জানিয়েছিলেন যে সুনীলকে একটু চাপে রাখার জন্যই তিনি এসব করেছিলেন। পঁচিশ টাকাটা তো ঘটনা নয় কোনো। সুনীল যথার্থ কবি বলেই তো বই-এর দায়িত্ব ঠিকমতো নিতে পারেননি। আর কবিরা ওসব পারে নাকি — বলেই হো-হো করে তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হেসে উঠেছিলেন রমেন্দ্রকুমার। চিঠিটা সেই সময়, আবহ, প্রেক্ষাপটকে জলজ্যান্ত করতেই এখানে হুবহু তুলে দিলাম। তাহলে সময়টার স্বাদ এখানে অন্তত খানিকটা হলেও উঠে আসবে।

প্রিয় রমেনবাবু, ৫.১.৬৫

আপনার চিঠি পেয়ে ও হারিয়ে ফেলায় ঠিকানার অভাবে এতদিন উত্তর দিতে পারিনি। আজ আবার খুঁজে পেলাম। ক্ষমা করবেন।

আপনার কবিতার আমি বিশেষ অনুরাগী। কিন্তু আপনার বইটি যথাযোগ্যভাবে পরিচিত ও প্রচারিত হয়নি এজন্য আমি দুঃখিত ও কুণ্ঠিত। এজন্য আমার দায়িত্ব নিশ্চিত কিছু ছিল।

কৃত্তিবাস থেকে যে-সব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সেগুলি প্রত্যেকটিই কবিরা নিজ ব্যয়ে ও উদ্যমে প্রকাশ করেন। কৃত্তিবাস প্রকাশনীর সঙ্গে কোনো বই-এরই কোনো ব্যবসায়িক সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ বই-এর আর্থিক লাভ বা ক্ষতি, কোনোটির জন্যই লেখক ছাড়া কেউ দায়ী নয়। বই-এর প্রচার, বিজ্ঞাপন, বিতরণ সব কিছুই লেখককে করতে হয়। আমরা শুধু প্রেসের ছাপার কাজটা দেখে দিয়ে থাকি — যেহেতু সব কবি ও সমস্ত টেকনিকাল ব্যাপার জানেন না — এবং কৃত্তিবাস প্রকাশনীর নামটা ব্যবহার করতে দিয়ে থাকি। এর বদলে, ফি হিসাবে, ঐ বই-এর কৃত্তিবাসে এক সংখ্যায় পাতাখানেক বিজ্ঞাপন ও তার চার্জ দিতে হয়।

আপনার বই-এর সময় আপনার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়নি। আপনার প্রতিভূ হিসেবে মানব সব দায়িত্ব নিয়েছিল। অনেকদিন কেটে গেছে মাঝখানে দীর্ঘদিন আমি কলকাতা ছিলাম না। ফলে, ও সম্পর্কিত বহু কথা আমার আজ আর মনে নেই। এইটুকু শুধু মনে আছে : একশো কপি বাঁধানো হয়েছিল। তার মধ্যে দশ কপি সিগনেট বুক শপে দিয়ে, বাকি বই মানবকে দিয়েছিলাম আপনাকে পৌঁছে দিতে। দপ্তরীখানার ঠিকানা মানবকে দিয়েছিলাম। দরকার হলে যাতে বাকি কপি ওখান থেকে বাঁধিয়ে নিতে পারে। আমি ভেবেছিলাম, আমার দায়িত্ব ওখানেই শেষ হয়েছে। 'দেশে' বিজ্ঞাপনের কথাটাও যেন ভাসাভাসা মনে পড়ছে। মানব আমাকে টাকা দিয়েছিল? বিজ্ঞাপন বেরোয় নি। এমনও হতে পারে, টাকা নিয়ে আমি খেয়ে ফেলেছিলাম। বিজ্ঞাপন দিইনি 'দেশে'। বা কৃত্তিবাসে বিজ্ঞাপনের খরচ হিসেবে ও টাকাটা কাটিয়ে দিয়েছিলাম। যাইহোক, 'দেশে' আপনার বিজ্ঞাপন বেরুনো উচিত — এবং আমি ঐ উল্লেখিত ২৫ নিশ্চয়ই আপনাকে ফেরৎ দিতে পারি।

আপনার সঙ্গে কখনো প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়নি। তবে, মনে হয়, আপনি খুবই লাজুক বা বিষম অহংকারী মানুষ। নইলে, নিজের কবিতার বই বেরুবার সময় একবারও প্রেসে আসে না — এরকম কবি আমি দেখিনি। আপনি মানবকে সব ভার দিয়েছিলেন। মানব অত্যন্ত মহৎ চরিত্রের পাগলাটে ধরনের ছেলে। তাছাড়া ওর জীবনেও অনেক ঢেউ গেল। ও হয়তো অনেক কিছু ভুলে গেছে। খুব একটা দায়িত্বসম্পন্ন বলে আমারও সুনাম নেই। যাইহোক, এখন আরশি নগরের পুনরুদ্ধারের কাজে আবার লাগা যেতে পারে। দপ্তরীখানার ঠিকানা : New India Binders, 5B, Patwar Bagen Lane, Calcutta-9. আপনি এখানে খোঁজ নিয়ে দেখবেন বাকি বইগুলির জন্য। আমিও খোঁজ নেবার চেষ্টা করব। Signet Book Shop-এও কয়েক কপি বই নিশ্চয়ই আছে — বা বিক্রীত বই-এর দাম।

আমি চাক্‌রি টাক্‌রি না পেয়ে খুব কুচ্ছিৎ অবস্থার মধ্যে আছি। তবু, আমি আপনার বই-এর পুরোনো সূত্র খুঁজে বার করার চেষ্টা করে — পরে আপনাকে আবার লিখবো। ভালোবাসা ও নমস্কার জানবেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সিদ্ধেশ্বর সেনের প্রথম কবিতার বই বেরোনোর গল্পটি আরও আশ্চর্যজনক। এখনকার দিনের নতুন কবিরা তা ভাবতেই পারবেন না। সমসময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় সিদ্ধেশ্বর সেন। *পরিচয়*-এ তখন তাঁর রাশি-রাশি কবিতা তরুণ কবিদের মুখে-মুখে ফিরছে। তাঁর কবিতার বিশেষ অনুরাগী শঙ্খ ঘোষ একদিন *অরুণা প্রকাশনী*-র বিকাশ বাগচিকে বলেছিলেন : আপনারা কবিতার বই ছাপাতে চাইছেন। এতদিন ধরে কবিতা লিখছেন সিদ্ধেশ্বর সেন, তাঁর কোনো বই কেন ছাপছেন না আপনারা? বিকাশ বাগচি সঙ্গে-সঙ্গে বলেছিলেন শঙ্খ ঘোষকে : এনে দিন, এক্ষুনি দেব ছেপে।

সেই শুরু। শঙ্খ ঘোষ আর সিদ্ধেশ্বর সেন একদিন দুপুরে শঙ্খ ঘোষের বাড়িতে বসেই বহু কবিতা থেকে সাজাই-বাছাই করে তৈরি করে ফেললেন অবশেষে সিদ্ধেশ্বর সেনের প্রথম কবিতার বই-এর পাণ্ডুলিপি। অগ্রজ কবির পাণ্ডুলিপি তৈরির পর শঙ্খ ঘোষ তাঁকে বলেছিলেন : ওটা তো এখন আমারই কাছে থাকবে? কাল দিয়ে দেব প্রকাশককে।

সিদ্ধেশ্বর সেন বলেছিলেন : হ্যাঁ, সে তো ঠিক, কিন্তু কী জানেন, দেবার আগে বাড়িতে বসে আরেকবার সবটা দেখে নিলে হয় না?

কবির সেই দেখা — ইতিমধ্যে পরশু দিন দেবার কথা, অতিবাহিত হয়ে মাস ঘুরে বছরের পর বছর কেটে যায়। বই আর হয় না সিদ্ধেশ্বর সেনের। শঙ্খ ঘোষও তখন প্রকাশককে এড়িয়ে চলেন। তিনি যে পাণ্ডুলিপিটি চাইছেন!

তারপর কয়েক বছর পর একটু বেশি বয়েসেই সিদ্ধেশ্বর সেনের বিয়ের আসরে পত্রাহ্বান পেয়ে পৌঁছেছেন শঙ্খ ঘোষ। সেখানে বরসাজে সিদ্ধেশ্বর এসে হাত ধরলেন শঙ্খ ঘোষের। বললেন : পাণ্ডুলিপিটা হল কী...

আমতা-আমতা করছেন সিদ্ধেশ্বর সেন। তখন শঙ্খ ঘোষই বললেন : ওসব এখন থাক। আগে বিয়েটা হয়ে যেতে দিন।

সিদ্ধেশ্বর সেনের বিয়ের পরও কেটে গেছে বছরের পর বছর। বই আর হয়নি তাঁর। তারপর *পরিচয়*-এর অনুরাগীরা অরুণ সেনের ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধেশ্বর সেনকে খানিকটা এড়িয়েই বার করে দেন তাঁরই প্রথম কবিতার বই *ঘন ছন্দ*

মুক্তির নিবিড় (১৯৮০)। চুয়ান্ন বছর বয়সে চল্লিশের জনপ্রিয় এই কবির প্রথম কবিতার বই বেরোয়। আজকের দিনে যাঁরা লিখতে এসেই ভাবেন বই থাকা দরকার — পত্রিকাতে হাত পোক্ত করার আগেই বেরিয়ে যায় প্রথম কেন দ্বিতীয়, তৃতীয় কবিতার বই। ফলস্বরূপ যা হবার তাই-ই হয়। পাঠক ছুঁয়েও দেখেন না বই। কবিতামনস্কদের কাছে পৌঁছোয় না সে বই। কেবল কবির সমবয়সি স্বজনবন্ধু ঝড় তোলেন আড্ডার টেবিলে। যে বইকে অগ্রজরা গ্রহণ করেন না সে বই কতটা অবান্তর তা কি আর বলে বোঝাতে হবে। আর কবির স্বজনবন্ধু দু-দিন পরেই সে বই-এর আলোচনা থামিয়ে দেন। কেননা ততদিনে তো বেরিয়ে গেছে তাঁর বা অন্য কারো প্রথম কবিতার বই। আর এভাবেই বাংলা কবিতার বাজার ভরে যাচ্ছে সব অপটু হাতে লেখা প্রথম কবিতার বইতে। যা কবিতার ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে অমঙ্গলসূচক। তবে ক্ষণস্থায়ী এসব আবর্জনা নিয়ে কবিতামনস্ক পাঠকদের মাথাব্যথা নেই। অগ্রজ, মৃদু অগ্রজ বা প্রকৃতমনস্ক তরুণরা এদিকে ঘুরে তাকানও না। এটা আবার কবিতার পক্ষে প্রবল ভরসার। সংযমী তরুণ এখনও তো আছেন যাঁরা হাতমকশোকে কখনোই গ্রন্থভুক্ত করতে চান না। এখনও তো সস্তার বাজিমাতের এই ঝরা সময়ে এমন তরুণও আছেন যিনি তাঁর প্রথম কবিতার বই-এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে হাজির হয়ে যান অগ্রজদের বাড়ি। পরামর্শ চান। মতামত নিয়ে ঝাড়াই-বাছাই করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন তাঁর প্রথম কবিতার বই-এর পাণ্ডুলিপিটি। সত্তর দশকের এমন সব প্রথম কবিতার বই-এর কথা আমরা তো জানি, যেগুলো সব বের হয়েছিল অগ্রজদের সঠিক তত্ত্বাবধানের নির্দেশিকায়। সত্তরের অত্যন্ত জনপ্রিয় দুই কবি জয় গোস্বামী আর সুবোধ সরকারের প্রথম কবিতার বই বেরিয়েছিল দেবদাস আচার্যরই ব্যবস্থাপনায়। *ভাইরাস* প্রকাশিত এই দুই প্রথম কবিতার বই বাংলা কবিতাকে এখনও কিন্তু অনেকখানি আলো করে আছে। যদিও সুবোধ, সুবোধ হয়ে উঠেছেন *ঋক্ষ মেষ কথা* থেকেই। কিন্তু জয়ের প্রথম কবিতার বই — যা কিনা বেরিয়েছিল দেবদাস আচার্যর পত্রিকা-প্রকাশনী *ভাইরাস* থেকেই ১৯৭৭ সালে। মাত্র বারো পাতার সেই বই বেরোনোমাত্রই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। সত্তর দশকের কবিদের যে বইগুলো বাংলা কবিতার সন্দর্ভকে পরিপুষ্ট করেছিল — আজও সদ্য তরুণ কবি লিখতে এসে যে বইগুলোর খোঁজ করে, সেগুলো কিন্তু সবই প্রথম কবিতার বই। *জলপাই কাঠের এসরাজ, আমাদের লাজুক কবিতা, দেবদারু কলোনী, কলম্বাসের জাহাজ* বইগুলো কিন্তু সবই প্রথম কবিতার বই। সত্তরের জমিল সৈয়দের প্রথম বই *নীল ক্ষুর চন্দ্রযান*-ও বেরিয়েছিল বেশ দেরিতে অরুণ বসুর তত্ত্বাবধানে। ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয় এই বইটি। প্রকাশমাত্রই সাড়া ফেলে তা পাঠকমহলে। কিন্তু আশ্চর্য! সমাদৃত কবি হয়েও জমিল কবিতার জগৎ থেকে সরে গেলেন। আবার সত্তর দশকের আরেক গুরুত্বপূর্ণ কবি গৌতম বসুর কাব্যপুস্তিকা *অন্নপূর্ণা ও শুভকাল* বেরিয়েছিল ১৯৮১ সালে। পঞ্চাশের কবিরা পর্যন্ত সাদরে গ্রহণ করেছিলেন কবির এই প্রথম বইটিকে। কৃশতনু এই বইটির কথা বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতকে বলেছিলেন উৎপলকুমার বসু। বীরেন্দ্রনাথ তখন শিলং-এ। কালীকৃষ্ণ গুহর থেকে বইটিকে নিয়ে সত্তরের আরেক কবি দেবাশিস তরফদার; তিনিও তখন শিলংবাসী — তাঁরও প্রথম কবিতার বই *আপেলের বিকল্প* (১৯৮৩) খুবই আলোড়ন ফেলেছিল পঞ্চাশের কবিদের কাছে, তা এই দেবাশিস তরফদারই গৌতমের বই কালীকৃষ্ণ গুহর কাছ থেকে নিয়ে জেরক্স করে বীরেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ আবার *প্রতিক্ষণ*-এর অরুণ সেনকে বলেছেন এই বইটির কথা। অনুজের বই নিয়ে বেশ অগ্রজের এমন উন্মাদনা এখন এ সময়ে কল্পনাতীত ঠিকই। অগ্রজরা আছেন কিন্তু অনুজের বলিষ্ঠ, ছাপ রাখার মতো প্রথম কবিতার বই সেই অর্থে সত্যিই বেরোচ্ছে কি? দু-হাজারে আমরা যাঁরা লেখালিখি শুরু করেছিলাম তাঁদের অনেকেরই এখনও এক বা দুটি বই — কারো-কারো একটিও নয় অথচ আশ্চর্য আট-নয়ে লিখতে এসে অনেকের আবার চার-পাঁচটি কবিতার বই। এইসব বহুপ্রজ কবিদের প্রথম কবিতার বই যে স্বীকৃত হবে না, অগ্রজরা ঘুরেও দেখবেন না — এ তো যথার্থ স্বাভাবিক। কেননা এটা তো ঠিক, এইসব তরুণের অনেকেই লিখতে পর্যন্ত শেখেন নি। মৃদুল দাশগুপ্ত একবার আমায় বছর-বিয়োনো কবিদের কথা বলেছিলেন। এঁরাও অনেকটা আমার মতে তাই। আবার এটাও ঠিক, কোনো সম্ভাবনাময় তরুণ কবির বই হয়তো বেরিয়েছে কিন্তু সেটা সেইভাবে পৌঁছোতে পারছে না মনস্কদের হাতে। মৃদু অগ্রজ, অগ্রজরা তার হদিশ জানতেও পারছেন না। নব্বই দশকের বেশ কয়েকজনের প্রথম কবিতার বই বাণিজ্যিক বড়ো মাপের প্রকাশনা থেকে বের হবার কারণে যথেষ্টই প্রচার লাভ করেছিল। *হৃদয় অবাধ্য মেয়ে*-কে তো পুরস্কারেও ভূষিত করা হয়েছিল। যা বড়ো প্রকাশনার যথার্থ অর্থেই বড়ো পুরস্কার। আশির কবি জয়দেব বসু, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অঞ্জলি দাশের প্রথম কবিতার বইগুলোও তখন অগ্রজরা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। সংযুক্তার *অবিদ্যা*-র নামকরণ পর্যন্ত করে দিয়েছিলেন উৎপলকুমার বসু। অঞ্জলির *পরীর জীবন* নিয়ে গদ্য পর্যন্ত লিখেছিলেন রঞ্জিত সিংহ, অরুণ বসুদের মতো অগ্রজরা। আশির আরেক কবি অপাবৃতা লাহিড়ীর (বর্তমানে, ধরিত্রীকন্যা) প্রথম কবিতার বই-এর সেই উন্মাদনার কথা, লেখার নতুন ভাবভঙ্গির কথা আমাকে বলেছিলেন দেবারতি মিত্র। বলেছিলেন : *আমার পোস্ত-বাটা, আমার ভাত-খাওয়া, আমার চুল-বাঁধা*-র মতো এত সাবলীল কবিতা ক-টা লেখা হয়েছে। বিজয়া মুখোপাধ্যায় লিখিত আকারেই জানিয়েছিলেন তাঁর অপাবৃতার *হারানো মণি* ভালো লাগার কথা। পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে উৎপলকুমার বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়রা নিজস্বতার স্বাক্ষর কিন্তু রেখেছিলেন একেবারে প্রথম কবিতার বই থেকেই। অপরদিকে সুনীল, প্রণবেন্দু, সুধেন্দু মল্লিক, তারাপদ রায়রা নিজেদের জাত চিনিয়েছিলেন দ্বিতীয় বই থেকেই। শরতের প্রথম কবিতার বই-ও সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেনি। *আহত ভ্রূবিলাস* থেকেই যথার্থ খ্যাতি পেয়েছিলেন তিনি। আর বিনয় মজুমদার — বলে দিতে হবে না কোন কবিতার বই তাঁকে খ্যাতি ও একাধারে মিথের সিংহাসনে বসিয়েছিল। কিন্তু তা কখনো কবির প্রথম কবিতার বই নয়। পঞ্চাশের কবি যুগান্তর চক্রবর্তীর যে গ্রন্থ তাঁকে কবিতার জগতে স্বমহিমায় চিহ্নিত করেছিল, তা-ও তাঁর প্রথম কবিতার বই নয় কখনোই। *স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশী* তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বই। প্রথম বই *তিমির, সীমান্ত*। *স্মৃতিবিস্মৃতি...* তাঁকে কিংবদন্তি করেছিল ঠিকই, কিন্তু দুঃখের বিষয় অসুস্থতা, প্রবল অসুস্থতার কারণে তিনি কলম থামিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বহুদিন নীরবতার পর তিনি ২০০৪ সালে স্ত্রী শিপ্রা চক্রবর্তীর অনুলিখনে কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন, যা ছাপা হয়েছিল সেই সালের শারদীয় *পরিচয়* পত্রিকায় কবিরই ইচ্ছানুসারে। তারপর থেকে তিনি আবারও নীরব হয়েই প্রবল অসুস্থতা নিয়ে কেবল জীবিতই আছেন। কিন্তু আশ্চর্য! নীরব কবির বই *স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশী* আজকের তরুণ এখনও খোঁজ করেন। আর ভুল করেন এটা তাঁর প্রথম কবিতার বই বলে।

অলোকরঞ্জনের প্রথম কবিতার বই সেই বিখ্যাত *যৌবন বাউল*-এর নাম কিন্তু কবি করেছিলেন *পরাণ আমার স্রোতের দীয়া*। পরবর্তীতে বন্ধুদের বিশেষত শঙ্খ ঘোষের পরামর্শে বইটির নাম হয় *যৌবন বাউল*।

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের প্রথম কবিতার বই সংক্রান্ত গল্প শুনেছিলাম তাঁর মুখেই। *পরবাসী* বেরিয়েছিল ১৯৫৯ সালে, তারপর *সাক্ষাৎকার* ১৯৮৫ সালে। প্রচ্ছদ করে দিয়েছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। *সাক্ষাৎকার*-এর প্রচ্ছদ করে পূর্ণেন্দু পত্রী কবিকে বলেছিলেন : এর পরের বই-এর প্রচ্ছদটাও করে রাখি। কেননা সেটা তো বেরোবে আরও পঁচিশ বছর পর। তখন তো আমি থাকব না।

আলোক সরকার তাঁর *আত্মজীবনীর অংশ*-এ লিখেছেন তাঁর প্রথম কবিতার বই সম্পর্কে মথিত স্মৃতির কথা। আমরা সেটাকে খানিকটা এখানে ছুঁয়ে নেব তাঁর ভাষাতেই —

> আমার প্রথম কবিতার বই 'উতল নির্জন' প্রকাশ করি ১৯৫০-র বৈশাখ মাসে। চৈত্র মাসে পাতাঝরার দিনগুলোর পাশে অসহায় দাঁড়িয়ে থাকার অভিজ্ঞতা আমি ভুলিনি; সারাজীবনই ভুলতে পারলুম না। তা আমার জীবনে আজও অনতিক্রমনীয় নির্দেশ।
>
> ১৯৪৮-এর চৈত্রশেষের দিনে 'ফিনিক্স' কবিতাটি রচনার পর আমার মনে হল, বাঃ বেশ একটু নিজের করে লিখতে পেরেছি তো!

খুব দ্রুত আরো অনেকগুলি কবিতা রচিত হল। কিন্তু তা আর পত্রপত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্বাচিত হয় না। গতানুগতিকভাবে লেখা কবিতাগুলি হয়। ১৯৪৯-এর শেষদিকে ঠিক করলুম একটা কাব্যপুস্তক প্রকাশ করতে হবে।

আমার বিবেচনায় স্বচিহ্নিত কবিতাগুলির সঙ্গে আরো কিছু আগের লেখা কবিতা যুক্ত করে একটা পাণ্ডুলিপি তৈরী করা হল। বই দু ফর্মার মতো হবে, খোঁজ নিয়ে জানলুম প্রকাশ করতে অন্তত একশো টাকা দরকার। মার কাছে টাকা চাইলুম, মা বল্লো আগে দাদাকে দেখিয়ে নে।

কবিতা রচনা করে কখনো দাদা, মানে অরুণকুমার সরকারকে দেখাতাম না, প্রায় কারুকেই দেখাতাম না। আমার কবিতা রচনা একটা গোপনীয়তা পছন্দ করত।

পাণ্ডুলিপি অরুণকুমারের হাতে পড়তে তার কিছু সংশোধিত হল। ঠিক কোন কোন অংশে কীভাবে সংশোধিত হল, তা একেবারে মনে নেই।

৫০-এর ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি 'উতল নির্জন' প্রেসে ছাপার জন্য দিলুম। যেমন হয়ে থাকে ছাপাখানায় পৌঁছনো মাত্রই যে ছাপার কাজ শুরু হল, তা নিশ্চয় নয়। দু ফর্মার বই ছাপতে যে কম করেও দু মাস সময় লাগবে তাতে আর বিস্ময় কি! তবু টানা দু মাস প্রেসে যাওয়া আর প্রুফ না পেয়ে ফিরে আসার মধ্যেও একটা বড় লাভ হয়েছিল আমার। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের সেই প্রেসে একই সঙ্গে তখন ছাপার কাজ চলছে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার। আবাল্য রহস্য-ভরা 'কবিতা' পত্রিকা, তার পুরো পাণ্ডুলিপি প্রেস ম্যানেজারের টেবিলে ওই পড়ে আছে, সেই পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া পড়ার আমার কোনো নিষেধ নেই। একটার পর একটা পাণ্ডুলিপির পাতা উল্টে যেতাম। কাদের স্বহস্তে লেখা পাণ্ডুলিপি? বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, কে নেই। নিষিদ্ধ দরজা খোলার আগে শরীর যেমন শিউরে ওঠে, হৃদপিণ্ডের গতি বাড়ে, আমারও তেমন অবস্থা! স্বর্গরাজ্যে অনধিকার প্রবেশ।

কী নিষ্ঠার সঙ্গে 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদনা করতেন বুদ্ধদেব বসু। প্রত্যেক কবির রচনাই কিছু না কিছু সংশোধিত হত। এমনকী জীবনানন্দ দাশের পাণ্ডুলিপিও অক্ষত থাকত না — নাম মনে নেই, প্রথম লাইন 'আমাকে খোঁজ না তুমি বহুদিন' — কবিতার শেষ লাইনে 'নারীটিরে' কেটে 'ঈঙ্গিতারে' করা হয়েছিল। অবশ্য এমন হতেই পারে এই সংশোধন জীবনানন্দর নির্দেশ অনুসারেই ঘটেছিল। কবিতাটিতে আরো অনেক সংশোধন ছিল।

তরুণ কবিদের বেলায় এই মার্জনাকর্ম সাংঘাতিক হয়ে উঠত। অনেক সময় পুরো কবিতার ওপর কলমের দাগ দিয়ে পাশে নতুন ক'রে কবিতাটি লিখিত হত। বানান ভুলের তো কোনো ক্ষমা ছিল না।

১৯৫০-এর বৈশাখে 'উতল নির্জন' প্রকাশের পর কিছু বন্ধুবান্ধব তা সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। বিক্রির প্রশ্নই ওঠে না, ঠিকমতো বিলিও করতে পারিনি। তবু কিছু পত্রপত্রিকায় ডাকে পাঠিয়েছিলুম 'উতল নির্জন'। কিছু কিছু সমালোচনাও বেরিয়েছিল। 'সত্যযুগ' নামের সংবাদপত্রে লেখা হল 'বাংলা কাব্যলক্ষ্মীর আসরে তার নাম চিরস্থায়ী হয়ে রইল'। স্মরণ থেকে লিখছি, লাইনটা ঠিক নাও হতে পারে, তবে ভাবটা এইরকমই। যাইহোক, আমি তো আনন্দে দিশেহারা।

মণীন্দ্র গুপ্তর প্রথম কবিতার বই *নীল পাথরের আকাশ* প্রকাশের গল্প শুনেছিলাম কবির মুখেই। বত্রিশ পাতার সে বই-এ ছিল সেন্টার-স্টিচ। নামপত্র হালকা ধূসর হ্যান্ড-মেড কাগজে ফেডেড গ্রিন ও লাল রং দিয়ে ব্লকে ছাপা। তাঁর পরিকল্পনা ছিল পাঁচশো কপি বই ছাপার। বাজেট হল একশো টাকা। সেইমতো কাগজ আর মলাট কেনা হল। ছাপা হল। নিখরচায় যোগানন্দ প্রেসের পরিমল সেন নামপত্রের পাতাতে লেটারিং-এ নীল রঙের ইম্প্রেশন দিলেন। আর এসবেই ১০০ টাকা ফুড়ুৎ! অগত্যা কী আর করা। না-ভাঁজ হওয়া ফর্মা-মলাটের আবাঁধা বই নিয়ে মণীন্দ্র গুপ্ত একটা রিকশা ধরে চলে এলেন টালিগঞ্জের বাসাবাড়িতে। রোজ সময়-সুযোগ করে তিনি কিছু-কিছু বই ভাঁজ করলেন। কিন্তু সেলাই-কাটাই আর হল না। আর সে অবস্থাতেই ওই বই চারশো কপি বিক্রি হয়ে গেল। লাভ হল দ্বিগুণ।

আশির দশকের আরেক কবি অর্চনা আচার্যচৌধুরীর প্রথম কবিতার বইটি ছিল বারো পাতার। আটটি কবিতা ছিল তাতে। আর সেই পাতলা *একশৃঙ্গ অশ্ব* বেরোনোমাত্রই তখনকার সময়ের অতি পরিচিত মুখপত্র *অভিমান*-এ দেবদাস আচার্য বইটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে কালীকৃষ্ণ গুহ, ভূমেন্দ্র গুহদের *দরগা রোড*-এও বইটি রিপ্রিন্ট হয়। আর গৌতম বসুর বইটি যে কত পত্রিকাতে রিপ্রিন্ট হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই।

এখন প্রশ্ন হল, কবিতার প্রথম বই ঘিরে তো কবির উন্মাদনা, আবির্ভাব-আনন্দ একটা থাকেই। সৃষ্টিক্রিয়ার নিজস্ব নিয়মেই তা রচিত হয়। তৈরি হয়। কখনো কবির প্রত্যাশা পূরণ হয়। পাঠকহাতে প্রথম কবিতার বই-এর সমাদর ঘটে। আদৃত হন কবি। কখনো তা ঘটে না। বিভ্রান্তিক উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি বাংলা কবিতার ভূমিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই-ই কবির প্রথম কবিতার বই নয়। আরেক দিক থেকে আবার অনেক বই-ই যা কবিতার ক্ষেত্রভূমিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, তার সৃষ্টিগত ধ্রুপদী উদাহরণে এমন বেশ কিছু বই-এর কথা এখানে বলা হয়েছে। আসলে কবির বহিঃ-সম্মোহনের ঘোর একটা কাজ করে প্রথম বই ঘিরে। প্রথম কবিতার বই অনেকখানিই সাংকেতিক কবির কবিতার জমিতে স্বশব্দ পদচারণার। প্রথম বই থেকে কবিকে সম্পূর্ণ বিকাশগত অধ্যায়ে পাওয়া যায় না ঠিকই, আবার অনুধাবনও তো হয় এক অর্থে কবি কতখানি নতুন ভাষা-আঙ্গিকের স্বাক্ষর রাখবেন কবিতার স্বভূমিতে। উৎপলের *চৈত্রে রচিত কবিতা* বলে দিয়েছিল এই কবি বাংলা কবিতার অঙ্গনে তৈরি হয়েই এসেছেন। গীতা চট্টোপাধ্যায়ের *গৌরীচাঁপা নদী, চন্দরা*, দেবারতি মিত্রর *অন্ধস্কুলে ঘন্টা বাজে* দেবদাস আচার্যর *কালক্রম* ও *প্রতিধ্বনি* স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, বাংলা কবিতায় এই তিন কবি নিজস্ব পুরোধার একেবারে স্ব-স্ব বৃত্ত তৈরি করবেনই। জয়, মৃদুলের হয়ে ওঠার চিহ্নরূপ তো ছিল প্রথম কবিতার বইতেই। গৌতম বসু, রণজিৎ দাশের ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। অপরদিকে সুবোধ সরকার, নির্মল হালদার, বীতশোক ভট্টাচার্য, অমিতাভ গুপ্ত, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরাধা মহাপাত্রদের প্রথম বই ছিল কবির নির্মীয়মাণ কবিতাগৃহের খানিকটা হলেও বন্ধ দরজা। পঞ্চাশের বহুখ্যাত কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতার বই সম্পর্কেও এ-কথাটি সদর্থক অর্থেই বলা যায়। সুনীলকে খ্যাতি দিয়েছিল তাঁর দ্বিতীয় বই। কোন বই সেটি আর নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না কোনো। 'নিখিলেশ' আর 'তাঁর নিজস্ব বেঁচে থাকার গল্প' আজ ইতিহাস। *ব্রহ্ম ও পুঁতির মউরি*-র কবি কিন্তু তাঁর ঘরানা চেনাতে সক্ষম হননি তাঁর প্রথম বইতে। মণীন্দ্র গুপ্ত *লাল স্কুলবাড়ি*-তে এসে তাঁর কবিতার মধ্যে যে অকূল অনিশ্চিতির অভিক্ষেপ তা পাঠককে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। অপরপক্ষে জমিল সৈয়দ, অপাবৃতা লাহিড়ী প্রথম বইতে বিপুল কবিখ্যাতি পেয়েও সেইভাবে আর লিখলেন কই। অপাবৃতার তা-ও পরবর্তীতে আর দু-টি বই হয়েছে। জমিলের তা-ও নয়। *পরীর জীবন* লিখে অঞ্জলি দাশ যে স্বতন্ত্রতা কবিতার পাঠককে উপহার দিয়েছেন তার সদর্থক ব্যবহার অঞ্জলি আর করেননি। সঞ্চয়িতা কুণ্ডু *মেঘবর্ণ রাখাল*-এর পর *রৌদ্রজীবী শ্যামবালিকা* লিখলেন ঠিকই, কিন্তু তারপরই শুরু হল তাঁর দীর্ঘ নৈঃশব্দ্য। *ভ্রমণকাহিনী*-কে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন জয়দেব বসু তাঁর *মেঘদূত*-এ, কিন্তু শুনতে পাই তিনিও এখন লেখালিখিকে অব্যাহতি দিয়েছেন। *আমপাতার মুকুট* লিখেছিলেন আজকের স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার। সে বই-ও পাঠক-দরবারে সমাদৃত হয়েছিল। কিন্তু আর কোনোদিন সেভাবে কবিতাই লেখেননি অভিরূপ। নব্বই দশকে লিখতে এসেছিলেন বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত ভৌমিক, রোশনারা মিশ্র, আবীর সিংহ। এঁদের সকলেরই প্রথম বই একটা নির্জন স্বাক্ষর রেখেছিল ঠিকই। কিন্তু এঁরা আর লিখলেনই না। সাম্যব্রত জোয়ারদারের মতো শক্তিশালী কবিও প্রথম বই-এর পর নিঃশব্দ হয়ে রইলেন।

যেটা এখানে বলতে চাইছি, কেন এমন হয়? কবি কেন তাঁর ব্যাসার্ধের ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ করতে পারেন না? প্রথমের স্থাপিত আবির্ভাবের পর উত্তরজাতকের মায়াবী চোরাটানেই তিনি তলিয়ে যান কেন? ধারাবাহিকতা থেমে যায় কেন? উত্তর এর একটাই : ভেতরের প্রেরণার অভিঘাত তাঁর ফুরিয়ে যায়। না হলে সম্ভাবনা, রণন তাঁর অতল পর্যায়ে পৌঁছে যায় না কেন? ফিরে আসার টান কেন তিনি আর সেইভাবে অনুভব করেন না? এক্ষেত্রে যেটা হয়, কবির ভালোবাসা কমে আসে। বাহুল্যের নানা সীমারেখা তৈরি হয়ে যায়। আর পাঠক, যিনি আশা করেছিলেন কবির কাছে আরও ব্যাপ্তির, আরও নতুন সম্ভাবনার প্রলয়ঙ্কর সব তৈজস, তাঁর সেই আশা কাচের বাসনের মতো অসতর্কে ভেঙে যায়। অন্য সব কবির নানা প্রাচুর্যের নতুন সব সৃষ্টির সম্ভাবনায় তিনি তখন মেতে থাকেন। আর এক্ষেত্রে উল্লেখিত কবি তখন তাঁর কাছে আক্ষেপের একটি বই-এর কবি। পাঠকের প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, চাহিদা আর জোগান-রেখাতে প্রথম সম্ভাবিত বই-এর সমীকরণ থাকে ঠিকই আত্মগাহনের বাঁকে। আমার মতে, পাঠক আবার কবির প্রথম বইকে তো এভাবেই দেখতে পারেন, যে, যে-বইটা তিনি নামিত কবির পাঠ করলেন সেটাই তো তাঁর কাছে প্রথম কবিতার বই। সেটাই কবির আশ্রয়-ইতিহাস। বিষয়টিকে এভাবেও দেখা যেতেই পারে। যেমন — উৎপলকুমার বসু দেখেছেন আরেক উদ্বুদ্ধ সম্ভাবনায় তাঁর প্রথম কবিতার বইটিকে —

> ...চল্লিশ বছর আগে, এমনই মাঘ-ফাল্গুনে, ছাপা হয়েছিল আমার প্রথম বই। এই আবিষ্কার যেন, আজ সকালে, ঘুম ভাঙিয়েদিল। তারপর কী কী করলে — নিজেকেই প্রশ্ন করি। ম্লান হেসে বলতে হয় — তেমন কিছুই উঠতে পারিনি।
>
> আসলে, ভুলে গেছি। কেন স্মৃতি পুনরুদ্ধারে আমি দক্ষ নই? এ-নিয়ে অল্প-বিস্তর ভেবেছি। আমাদের মন হয়ত নিখুঁতভাবে, ক্রম-অনুসারে, প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে সাজিয়ে রাখে না। বরঞ্চ জড়িয়ে-মড়িয়ে, এক বিশাল অবিন্যস্ত ভাঁড়ার-ঘরের মতই, এলোমেলো তাকে-আলমারিতে, বাসনে-বোয়েমে, হাঁড়ি-কলসীতে সংগ্রহ করে রাখে জীবনের যা-কিছু স্মৃতি-সম্পদ। তারই ফাঁকে-ফাঁকে ঘোরে ক্ষুধার্ত ইঁদুর, কালজয়ী আরশোলা আর কোণে দাঁড়-করিয়ে রাখা ভাঙা কুলোটাকে অগ্রাহ্যই বা কীভাবে করি? ছাই ফেলতে ওটা যদি লাগে?
>
> দেওয়ালে টাঙানো মলিন ম্যাপের কথা স্মরণে আসে। ঝুলছে ছবির ক্যালেন্ডার। পাতা ছেঁড়া, বহু পুরনো বছরের। এবং আছে স্থিরচিত্র। উনোনের ধোঁয়া-কালো দেওয়ালে, কাচ-বাঁধাই কাঠের ফ্রেম। গোল চাকার মতো বৃত্তের ভিতরে বৃত্ত, তারপর একে একে ছোট হয়ে-আসা, ঘন এবং ধূসর হতে-থাকা, বালি কাগজের সঙ্গে একাত্ম আলেখ্য — কাশী বিশ্বনাথ, জগন্নাথদেব, শ্রীদ্বারকা, মক্কার কালো পাথর, দূরে আকাশের কোনা ঘেঁসে উর্দু বাক্য, সংস্কৃত সুভাষিত, অক্ষরের শস্য, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে, হিমালয়ের সুপ্রভাত, বিন্ধ্যের সূর্যাস্ত, মরুভূমির নিদ্রাহীনতা।
>
> ঐ সবই কি আমার প্রথম বই নয়? লিপিকার হয়ে-ওঠার প্রথম সংস্করণ কি ঐসব অনুশীলনী নয়?

উৎপলের এইসব প্রশ্নই আমাদের ভাবিত করে। কবির প্রথম বই-এর নির্জিত প্রতিনিধি হিসাবে তখনই দাঁড়িয়ে পড়ে কবিতার অগ্রগামী নানা সব জটিলাঙ্গের ঋজু বহুমুখীন ছায়া। তার সামনে দাঁড়ালে পাঠককেই থমকে যেতে হয় তারই পাঠের সদর্থক সম্মতির ধ্যানধারণায়। এ কবির নয়, তখন পাঠকেরই মুমূর্ষু বিড়ম্বনা। আর তার শুশ্রূষা দিতে পারে হয়তো তারই প্রিয় কোনো কবির প্রথম কবিতার বই। হয়তো বা সেটি কবির প্রকাশিত দ্বিতীয় বা তৃতীয় কোনো বই হতেও পারে। কিন্তু পাঠক সেটি পড়েই কবিকে একাত্ম করে ফেলেছেন একেবারে নিজের সঙ্গে। পাঠকের তখন একে কবির প্রথম কবিতার বই ভাবতে কোনো দ্বিধা থাকে না। কবি তা না-মানলেও পাঠকের এখানে কিছুই করার থাকে না। কেননা তিনি তো কবির সেই বইটিই প্রথম পড়ে কবিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন।

ঋণ স্বীকার : রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, মণীন্দ্র গুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, দেবদাস আচার্য, মৃদুল দাশগুপ্ত, দেবারতি মিত্র

কবির প্রথম বই ও তার প্রতীচী উত্তর

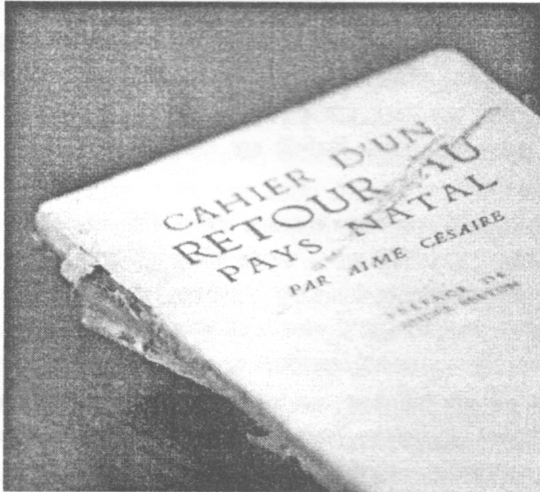
শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবির প্রথম বই নিয়ে যে আদিখ্যেতা বাংলাভাষী ভূগোলে আছে (যার শুরু বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে) তা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় থাকা আন্তর্জাতিক মানচিত্রে নেই। সে মানচিত্র অবশ্য এস্পানিওলভাষী কুড়িটি দেশের দেড়খানা আমেরিকা মহাদেশ আর এস্পানিয়া নামক একটি দেশ দিয়ে তৈরি। আর তার আশপাশে থাকা প্রতীচীভূগোল ঘাঁটলে দেখা যায় কোনো ক্ষেত্রে কবির পরিচিতি হবার পর তার প্রথম বই নিয়ে কথা বলা শুরু হয় (এস্পানিওলভাষা অঞ্চলেও তাই)। কয়েকটা বিক্ষিপ্ত ব্যতিক্রম বাদ দিলে আর ইংরেজি ভাষাভূগোলের কয়েকটা নাম বাদ দিলে প্রথম বই নিয়ে খুব হইচই কম দেখা যায়। প্রথমেই মনে পড়ে যাচ্ছে রবার্ট ফ্রস্ট-এর বিখ্যাত উদাহরণ, যাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম কবিতা প্রকাশের চার দশক পরে। অতএব তরুণ কবিটি তিনি তখন ছিলেন না। পাবলো নেরুদা-র প্রথম বই *ক্রেপুসকুলারিও* তিনি নিজেই লুকোতে চাইতেন। তবে সেসার বাইয়েখো-র (পেরু) ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তাঁর প্রথম বই থেকেই তিনি সকলের নজর কেড়েছিলেন, কিন্তু একটু বিস্তারিত দেখলেই দেখা যাবে তাঁর প্রথম বই *কালো ঘোষণাগুচ্ছ* বেরোচ্ছে তাঁর কারাগার-পর্বের কবিতা নিয়ে, যাতে বাদ পড়ে থাকছে তার আগে দীর্ঘদিন ধরে লেখা আরও অজস্র কবিতা। টি এস এলিয়ট-এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, গত একশো বছরের যত উদাহরণ ঘাঁটছি অভারতীয় কবিতার, তত বেশি করে নজরে আসছে এক তথ্য যে, কবির প্রথম বই-এর প্রতি আগ্রহ (অন্তত, প্রতীচী দুনিয়ায়) কম। দেখা যাচ্ছে কবির পরিণত কাব্যগ্রন্থের প্রতিই পাঠকের আগ্রহ বেশি। আর আমরা গত পঞ্চাশ বছরে বাংলায় দেখছি উলটোটা।

এবার যদি প্রতীচী দুনিয়ার গত পঞ্চাশ বছরের দিকে তাকাই তাহলে অন্য এক চিত্র সামনে আসবে। গত পঞ্চাশ বছরে কবিতার 'পাঠক' কমতে-কমতে প্রায় শূন্য। চিলে-র মতো কবিতাপ্রবণ দেশেও দেখা যাচ্ছে এই চিত্র। প্রকাশিত হয়ে চলেছে রাশি-রাশি কবিতার বই। কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা হাতে গোনা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কবি নিজের পয়সায় বই কিনে বিলোচ্ছেন বন্ধুদের। বা নিজেদের করা বই। আর এই চেহারায় ওরা পঞ্চাশ থেকে সত্তর অবধি গুনলেও তারপর দশক বিভাজন বন্ধ করে দিয়েছে। কেউ বলেন, কবিতার পাঠক নেই। কেউ বলেন, পাঠকরাই এখন কবিতা নামক শিল্পমাধ্যমে লেখক হিসেবে অংশগ্রহণ করছে (যাঁরা টেক্সট নামক পোস্টমডার্ন ধারণার কথা বলে হইচই করবেন, তাঁদের জানাই জাক দেরিদার পুত্র পিয়ের আলফেরি এই মুহূর্তের ফরাসি সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ লেখক, যিনি কবিতা ও উপন্যাস নামক দু-টি আলাদা ফর্মে আস্থা রেখেছেন আরো অনেক লেখকদের মতো)। অর্থাৎ আর কোনো আকাদেমিয়া বা মেগা প্রকাশক পিছনে নেই কবি করে তোলার কাজে। লেখার ক্ষেত্র হয়েছে উন্মুক্ত। গ্রহণ ও বর্জন হয়েছে সহজ। আর এরই ফলে প্রথম বা দ্বিতীয় বই নয়, কবির সমগ্রতাই বিবেচিত হচ্ছে এখন। আমি বেশ কয়েকবার কথা বলেছি সমসাময়িক কবিতা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে কাজ করেন এমন কয়েকজনের সঙ্গে। কথা বলে দেখেছি, কেন তাঁরা কবির প্রথম বইকে গুরুত্ব দেন না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। তরুণ কবির প্রথম বই তার স্বভাব-কবিত্বের সাক্ষ্য। আস্তে-আস্তে কবি পরিণত হয়, বেরিয়ে আসে তার পরিণত কাজ। আরেকটা মস্ত জিনিস প্রতিভা উৎপাদন কারখানা! অনেক ক্ষেত্রেই বড়ো প্রকাশনা সংস্থা কাউকে প্রডিজি 'তৈরি' করার ভার দিয়েছিল আগে। তাদের কাজ ছিল কোনো-কোনো জনপ্রিয়তার লক্ষণযুক্ত তরুণকে চিহ্নিত করে তাদের একেকটা বইকে বাণিজ্যিকভাবে সফল করার ব্রত নেওয়া। কিন্তু সে জিনিস ব্যর্থ হয়েছে আজ কয়েক বছর। কারণ কবিতার পাঠক চটুলতা পছন্দ করছে না। উদাহরণ হিসেবে চলে আসে এস্পানিয়ার লুইস গার্সিয়া মোনতেরোর কথা। একদা সুপারহিট প্রথম বই থেকেই বিপুল বিপণন হওয়া কবি আজ একেবারেই কোণঠাসা। কারণ কবিতার সে বাণিজ্য আর নেই। আমরা

আমাদের দেশেও অনেক সময় দেখেছি, (আমাদের সমসাময়িক) কত সুপারহিট কবির সমস্ত বই (শুধু কাগজেই হিট!) ৪০% ছাড়ের বইবাজারে কিনতে পাওয়া গেছে। কিন্তু এই সব ছাড়িয়ে যেটা চোখের সামনে ঘুরতে থাকে, সেটা আসলে কবিতার বর্তমান মানচিত্র।

যত দিন যাচ্ছে কবিতায় অংশগ্রহণ করা শিল্পীর সংখ্যা বাড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া-কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়ছে সৃষ্টিশীল লেখনপাঠশালার চল। পাশ করা কবির সংখ্যা আজ নিতান্তই কম নয় এইসব দেশে। আর সঙ্গে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য চোখে পড়ছে 'পুরোনো মহাদেশ'-গুলোয়। আমাদের দেশের মতোই আকাদেমিয়া নতুন লেখার প্রতি আগ্রহী নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রধানমন্ত্রীকে ছন্দে লেখা চিঠিকে কবিতা নাম দিয়ে প্রশ্রয় দিয়েছে তারা। একবার সামাজিক কবিতাকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দেবার পর থেকে যেকোনো সামাজিক সমস্যা-সম্বলিত ছন্দবদ্ধ কবিতাকে ঘিরে নেচেছে তারা। কিন্তু তথাকথিত নতুন ভূখণ্ডের কবিতা হাতে আসার সঙ্গে-সঙ্গে দেখা যাচ্ছে সামাজিক কবিতাই কবিতার শেষ কথা নয়। বাংলা কবিতা যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফতোয়া অগ্রাহ্য করে সবরকম কবিতাকে গ্রহণ করেছে এবং সামাজিক কবিতাকে একমাত্র মুক্তি না বলে, শুধুমাত্র একধরনের কবিতা বলে দেখেছে — গোটা দুনিয়ার চিত্রটা কতকটা একইরকম। যে চিলে নামক দেশটার পঞ্চাশ বছর আগে লেখা কবিতার অনুবাদ করে আমাদের দেখানো হত সামাজিক কবিতার মহত্ব, সেখানেই সেইসব 'মহৎ' কবিদের কারণে রাজনৈতিক চাপে থাকা কবিরা বর্তমানে প্রকাশিত হয়ে পড়লে বোঝা যাচ্ছে 'অসামাজিক' অন্তর্মুখী কবিতার জোর![১] কবিতা ছড়িয়ে যাচ্ছে আর মুহূর্তে হয়ে উঠছে আরও বেশি ঝুঁকিপ্রবণ এবং পরীক্ষামূলক।



এমে সেজেয়ারের *দেশে ফেরার খাতা*

আর এভাবেই অবান্তর হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন, একটু-একটু করে, প্রথম বা দ্বিতীয় বই নামক ধারণা, বিশেষ করে প্রতীচীবিশ্বে। ঠিক যেমন করে আমরা ষোলো বা সতেরো শতকের কবিদের প্রকীর্ণ কবিতা ছাড়া গ্রন্থ ধরে চিহ্নিত করতে পারি না (আখ্যান কাব্য বাদে), অবস্থা কি সেরকম নয়? আমি প্রশ্ন করি সতীর্থ কবিতা অধ্যাপককে। উত্তর আসে বহুস্তরী। যেমন নতুন ভূখণ্ডের লেখনপাঠশালার দৌলতে কবিদের সংখ্যাধিক্য স্বাভাবিক হয়ে গেছে, ঠিক তেমনি তার ফলে তৈরি হয়েছে আরেক মজা। অনেক কবির ক্ষেত্রেই প্রথম বই প্রকাশের অর্থ একসঙ্গে একাধিক পাণ্ডুলিপির প্রকাশ। বিশেষ করে সাতের দশকের পর থেকে যখন কবিতার বাণিজ্য সম্ভাবনা কমে গেছে, তখন প্রকাশকরা একসঙ্গে দু-টি বা তিনটি বই একই মলাটে প্রকাশ করছেন, ফলে প্রথম বই নিয়ে আলাদা করে আবেগপ্রবণ হওয়ার জায়গাটাও থাকছে না। সেই দু-টি বা তিনটি বই-এর সমাহারকেই প্রথম বই হিসেবে মেনে নেওয়া হচ্ছে।

তাহলে কবির প্রথম বই-এর গুরুত্ব কি আমাদের পশ্চিম গোলার্ধে নেই? তাহলে এমে সেজেয়ার-এর *দেশে ফেরার খাতা*, তাহলে ওক্তাবিও পাস-এর *প্যারোলে মুক্তি*, তাহলে ক্লাউদিও রোদরিগেস-এর *মগ্নতার উপহার* — আরও কত উদাহরণ মনে পড়ছে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের! আসলে ঘুরেফিরে সেই একই জায়গায় চলে যায় লেখার মুখ। আধুনিকতার এক অবদান হল একরৈখিকতা। আর তারই এক অনিবার্য ফল হল কবি নামক একরৈখিক এক ধারণার জন্ম, আর তারই আরেকধাপ পরে এল — প্রথম বই কেন্দ্রিক আদিখ্যেতা। (বাংলা বিষয়ে কথা বলার এক্তিয়ার আমার নেই, কারণ তার আকাদেমিয়া সৃষ্টিশীল লেখার প্রতি দরজা বন্ধ করেছে অনেকদিন। তবু বলি, পঞ্চাশ-পরবর্তী কালে যে প্রবণতা কবির প্রথম বইটিকেই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক করে দেখাতে চাওয়া, সেটা আমাদের স্বভাবকবিত্বকেই বাহবা দেওয়া নয়? নাকি সেইসব কবিরা কেবলই স্বভাবকবি?) যদিও পরে প্রমাণ হয়ে গেছে বার-বার যে, সিংহভাগ কবির প্রথম বই-এর চেয়ে পরবর্তী সময়ের রচনা অনেক বেশি পরিণত।

পঞ্চাশ থেকে সত্তর, এই তিন দশকে প্রতীচী দুনিয়ায় গেড়ে বসেছে ধনতন্ত্র। অনেক বেশি মজবুত হয়েছে গণতন্ত্রের ভিত্তি। বদলে গেছে দেখার চোখ। যে জ্বিগনিয়েভ হেরবের্টকে পোল্যান্ডের সবচেয়ে বড়ো আধুনিক কবি বলে গণ্য করা হত, আজ শুধুমাত্র কমিউনিস্ট হওয়ার জন্য তাঁকে দক্ষিণপন্থী বলে ধরা হয়! সমস্ত প্রাক্তন সমাজতন্ত্রী দেশের লোকের কাছে কাস্তে-হাতুড়ি, ইহুদির কাছে স্বস্তিকা চিহ্নের মতো ভয়ঙ্কর। আর এই বিপুল পরিবর্তনের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে কবিতা উক্ত পৃথিবীতে এক অন্য চেহারা নিয়েছে। যেখানে বিপুল সমাজতন্ত্রী চাপে কাতর জনতার সামনে ছিল বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, কিন্তু সঙ্গে ছিল ব্যক্তি কবির স্টেডিয়াম-ভরানো উপস্থিতি। সে দিন গিয়েছে। বাণিজ্যের সঙ্গে কবিতার যোগ নেই। 'লোকে' কবিতা দিয়ে নিজের না-পাওয়াগুলোকে মিলিয়ে নেয় না। কবিতা হারিয়েছে তার মনোরঞ্জন ক্ষমতা। আর এর ফলেই বড়ো প্রকাশনা সংস্থার শেষ বাজি কবিকে প্রডিজি প্রমাণ করা, সেটাও আর নেই।

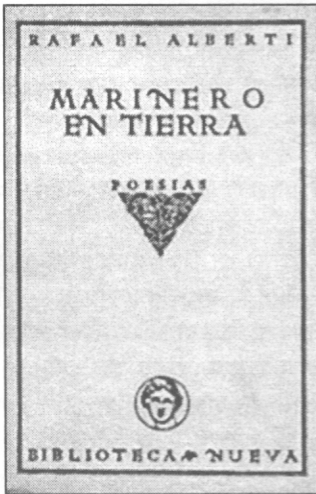
আমাদের এই বহুত্ববাদী সময় আসলে কবিতাকে তার আদি জায়গায় ফিরিয়ে দিয়েছে বলে মনে হয়। কাহিনিকাব্য বা আখ্যানকাব্য দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর যা পড়ে আছে, তা হল কবির সমগ্র কর্ম। গত পঞ্চাশ বছরের যদি একটা তালিকা করা হয়, তাহলে আমাদের সামনে উঠে আসবে কবিদের নাম ও হয়তো তাদের বিক্ষিপ্ত দুটো কি একটা বই, আসলে সে নামগুলো তাঁদের কবিতাকীর্তিরই চিহ্ন। তাঁদের প্রকীর্ণ কবিতা ধরেই এগিয়ে যাই আমরা। তবে যেহেতু গ্রন্থ নামক একটি বস্তু আবিষ্কার হয়ে গেছে, তাই জুড়ে যায় কিছু বিশেষ বই-এর নাম। যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলতেন যে তাঁর পুরো লেখাটাই আসলে একটা দীর্ঘ কবিতা যা খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে। আর একটু ঘাঁটালে দেখা যায়, প্রায় সমস্ত কবিরাই বিশ্বাস করেন এই কথা। সুতরাং কবির প্রথম বই নিয়ে প্রতীচী দুনিয়ার এই অবস্থান নতুন কিছু নয়।

২

এবার কিছু বিলিতি বিখ্যাত প্রথম বই-এর কথা দেখা যাক। আর এইসব বই-এর শতকরা নব্বই ভাগই বিশ শতকের প্রথমার্ধের, না হলে দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায় প্রকাশিত।

প্রথমেই যে বইটার কথা মাথায় আসছে, তার প্রভাবের তুলনা শুধুমাত্র *ফিরে এসো, চাকা*-র সঙ্গেই করা চলে। প্রকাশমাত্রই যে গোটা এস্পানিওল ভাষায় এই বইটি বিপুল আলোড়ন ফেলে দেয়, এমনটা নয়। কিন্তু এস্পানিয়া নামক দেশটিতে হইচই পড়ে যায়। প্রথাগত কবিতায় অভ্যস্ত পাঠক নতুন কবিতার

সন্ধান পান বইটিতে। স্বাভাবিকভাবেই তারপর ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন একই ভাষার অন্যান্য দেশে। বইটির নাম *মারিনেরো এন তিয়েররা* (*ডাঙায় নাবিক*), কবি রাফায়েল আলবের্তি। ১৯২৫ সালে যখন বইটি প্রকাশিত হচ্ছে, তখন এস্পানিয়ার আকাশে উজ্জ্বল খুয়ান রামোন খিমেনেস, আন্তোনিও মাচাদো-র মতো কবিরা। এই বইটির একটিই বিষয় — স্মৃতিতাড়না। এক কিশোরকে তার বাবা রৌদ্রকরোজ্জ্বল সমুদ্র শাসিত আন্দালুসিয়া থেকে নিয়ে এসেছিলেন আপাত-মেঘলা মাদ্রিদে। যে শহরকে নিয়ে সমুদ্রপ্রবণ এস্পানিওলরা বহুদিন আগেই প্রবাদ লিখে রেখেছেন — 'বাইযা বাইযা আকি নো আই প্লাইযা' (যাহ্ এখানে সৈকত নেই)! তা, হেন নির্জলা শহরে এসে আর্ট কলেজে সদ্য পা রাখা তরুণ কবি লিখে ফেললেন *ডাঙায় নাবিক*। তেইশ বছর বয়স তখন তাঁর। আর এই বইটিই সে বছর চিরকালীন পরীক্ষাকবিতাপ্রিয় এস্পানিয়ার প্রেমিও নাসিওনাল দে পোয়েসিয়া (কবিতার জাতীয় পুরস্কার) পেল। কারা ছিলেন সে বিচারকদলে? সেই আন্তোনিও মাচাদো, সেই খুয়ান রামোন খিমেনেস। তার আগে আর কোনো তরুণ কবি এই পুরস্কার পাননি। তবে এই তুমুল প্রতিভাবান কবি পরবর্তীকালে অবশ্য এই সুনাম বজায় পারেননি। দু-টি বই ছাড়া তাঁর বিপুল কাব্যসম্ভারকে কেউই বিশেষ গুরুত্ব দেয় না এখন।



রাফায়েল আলবের্তির *ডাঙায় নাবিক*

একটু দেশে ফিরি। ইংরেজিতে কবিতা লেখেন এমন লোকের সংখ্যা এখন কম না হলেও ডম মোরেস যখন লেখা শুরু করেন, তখন সংখ্যাটা নগণ্য বললেও কম বলা হত। *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*-র মতে : He was at age 19 the youngest winner of England's Hawthornden Prize for the best work of imaginative literature — for *A Beginnig* (1958) — and was at the time of his death still the award's only non-British recipient। টি এস এলিয়ট, স্টিভেন স্পেনডার প্রমুখ কবিদের দ্বারা বিপুল উৎসাহ পেয়েছিলেন মোরেস। এই *আ বিগিনিং* বইটি খুললে আজও শিহরন হয় এই ভাবলে যে, এক উনিশ বছরের কিশোর এই কবিতাগুলি লিখেছে! কী অদ্ভুত যে, এর ঠিক পরেই কাব্যদেবী মোরেসকে ত্যাগ করেন। মাঝে-মাঝে বিক্ষিপ্ত কবিতা উৎসারিত হলেও তা কিছুতেই তার শুরুকে ছাড়িয়ে যেতে পারছিল না। প্রায় কুড়ি বছর পরে মোরেস নতুন করে কবিতা লিখতে শুরু করেন কিন্তু সেই পুরোনো জায়গা আর ফেরত পাননি।[২]

এমে সেজেয়ার-এর মতো বিরাট মাপের কবির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে *দেশে ফেরার খাতা*-কে তিনি আর ছাড়িয়ে উঠতে পারেননি পাঠকের বিচারে। কিন্তু এরকম কয়েকটা বিক্ষিপ্ত উদাহরণ ছাড়া প্রথম বই থেকেই বিপুল কবি প্রতিভার 'আবির্ভাব' পশ্চিমি দুনিয়ায় বড়ো একটা হয়নি। পরবর্তীকালে প্রকাশক নিয়ন্ত্রিত দুনিয়ায় কিছুদিন সে চল উঠলেও পরে ওয়েব এসে তাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে প্রথম বই-এর হিট কবি পরে আর সে কবিতা লিখতে পারেননি। তাহলে কি বর্তমানের প্রতীচীসমালোচকের দেওয়া স্বভাবকবিতার ও স্বভাবকবির তত্ত্বই মেনে নেব আমরা?

[১] http://en.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Rojas
[২] http://www.tribuneindia.com/2004/20040801/spectrum/book4.htm

মলাট লিখন

ঋত্বিক মল্লিক

অনেকটা কমলালেবুর খোসার মতো, কিংবা বলা যায় সাবানের মোড়কের কথাও। ভেতরের বস্তুকে ঢেকে রাখা; বিক্রি হওয়ার আগে উলঙ্গ চেহারাটা না দেখানো। তাই লোক-দেখানো একটা আচ্ছাদন। 'আচ্ছাদন' শব্দের ভিতর রয়েছে 'ছাদি' ধাতু, যার মানে হল ছেয়ে থাকা বা আবরণ; প্রচ্ছদ বা পরিচ্ছদ-এর মধ্যেও রয়েছে সেই একই বীজ। স্বাদগ্রহণের সময় শরীর থেকে যা খুলে নিতে হয়, থাকলেও তেমন মনে রাখার মতো নয় এবং স্বাদগ্রহণের পর পরিত্যাজ্য, যদি না পুনরায় বিক্রি বা প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়!

ছোটো-বড়ো দু-একটা দেশীয় লাইব্রেরিতে আমি যা দেখেছি, বই-বাঁধাই-এর সময় প্রচ্ছদ বাদ যায়। কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতেও পুরোনো বই-এ অনেকক্ষেত্রেই প্রচ্ছদের বদলে সাদা পাতা আর হাতে লেখা বই-এর নাম। এই নিয়েই যেন কিছুটা অভিমান ঝরে পড়ে অজিত গুপ্তর লেখায়, 'প্রচ্ছদ শিল্পীদের সেইভাবে কেউ পাত্তা দেয় না। শিল্পী হতে চেয়ে হয়ে গেলাম প্রচ্ছদশিল্পী। একজন প্রচ্ছদশিল্পী হয়ে প্রতিষ্ঠা পাওয়া আর একজন চিত্রশিল্পী হয়ে প্রতিষ্ঠা পাওয়া হেল অ্যান্ড হেভেন তফাত'।

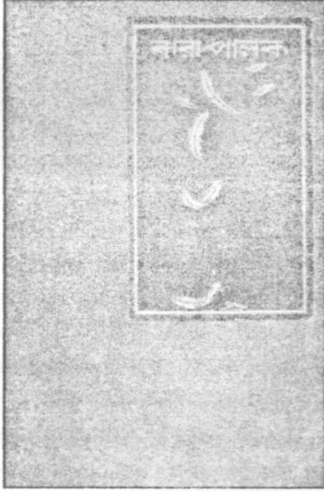
প্রচ্ছদের পাঁচটি পক্ষ আছে। প্রথমত ও প্রধানত, যিনি প্রচ্ছদ করেন, দ্বিতীয়ত যিনি লেখেন, তৃতীয়ত যিনি ছাপেন, চতুর্থত যিনি প্রকাশ করেন এবং শেষে, যিনি কেনেন। যাঁরা কেনেন এবং যাঁরা ছাপেন (প্রিন্ট করেন), তাঁদের বিষয়ে এখন কিছু বলার নেই। প্রকাশকদের নিয়ে বলার একটু আছে, পরে বলছি। প্রথম বই-এর প্রচ্ছদ নিয়ে যে গল্প, সেখানে প্রচ্ছদশিল্পী আর শুধুমাত্র লেখক।

এ গল্পের দুটো দিক আছে। এক, কবি-প্রচ্ছদশিল্পী-প্রকাশক, তিনপক্ষই নতুন; দুই, কবি বেশ প্রতিষ্ঠিত, প্রচ্ছদশিল্পী ও প্রকাশক প্রতিষ্ঠিত হতেও পারেন, নাও হতে পারেন। দ্বিতীয় প্রকারটি এ লেখার মুখ্য বিষয় নয়, তাই আগে এ সম্বন্ধে বলে নিই। শুধু একটি উদাহরণ। কবি এখানে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রচ্ছদশিল্পী সত্যজিৎ রায়, প্রকাশক সিগনেট প্রেস। সুধীন্দ্রনাথের তখন *তন্বী*, *অর্কেস্ট্রা*, *ক্রন্দসী*, *উত্তরফাল্গুনী* এবং *সংবর্ত*-র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত। সুতরাং তিনি তখন বেশ প্রতিষ্ঠিত। এই *সংবর্ত*-র দ্বিতীয় সংস্করণের ক্ষেত্রে তিনি দিলীপ গুপ্তকে (*সিগনেট প্রেস*-এর কর্ণধার) লিখলেন, 'মলাটের নকশা একটু বেশি ঘিঞ্জি মনে হচ্ছে। একটিমাত্র মোটা লাইন যদি কম্বুরেখায় পটের উপর থেকে নীচে নামে, প্রথম কুণ্ডলীতে বইয়ের নাম, দ্বিতীয়টিতে লেখকের স্বাক্ষর এবং তৃতীয়টিতে প্রকাশকের মুদ্রা নিয়ে — তাহলে কেমন দেখাবে?' প্রচ্ছদ নিয়ে এই আলোচনাটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য হতে পারে পরিস্থিতি যখন প্রথম প্রকার, অর্থাৎ কবির প্রথম বই, প্রকাশক ও প্রচ্ছদশিল্পীও নতুন।

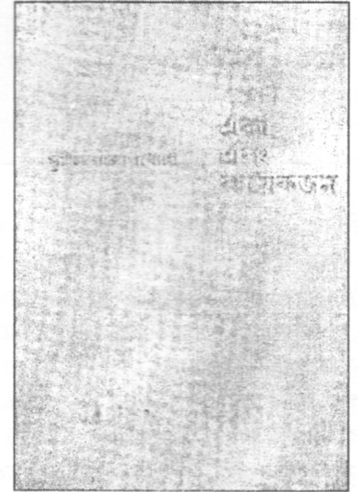
বাংলা ভাষায়, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক হয় তিনি নিজেই, নতুবা বন্ধুবান্ধব। যেমন জীবনানন্দ দাশের *ঝরা-পালক*, সুধীরচন্দ্র সরকারের নাম প্রকাশক হিসেবে মুদ্রিত ছিল; লক্ষ করুন — শুধুমাত্র ব্যক্তিনাম, কোনো

প্রতিষ্ঠান নয়। আর *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র প্রকাশক তো তিনি নিজেই। বিষ্ণু দের *উর্বশী ও আর্টেমিস* 'পিতার অর্থ সহায়তায় প্রকাশিত'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *পদাতিক* 'গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *একা এবং কয়েকজন* কিংবা উৎপলকুমার বসুর *চৈত্রে রচিত কবিতা* মূলত বন্ধুবান্ধবরাই প্রকাশ করেছেন। ক্রমশ এটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়। রণজিৎ দাশ লিখেছেন, 'প্রথম বই *আমাদের লাজুক কবিতা*-য় প্রকাশক হিসেবে নাম ছিল তপনকুমার মুখোপাধ্যায়ের। তপন আমার এক ঘনিষ্ঠ অনুজ বন্ধু, যে বইটি ছাপানোর সময় কিছু টাকা ধার দিয়েছিল এবং বইটির প্রকাশক সাজতে মহা উৎসাহে রাজি হয়েছিল।'

লিখলেন, 'আমার বন্ধু শ্রীঅনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রথম সংস্করণের মলাটচিত্র এঁকে বইয়ের মর্যাদা বাড়িয়েছিলেন; এবারেও তিনি মলাটের জন্য নতুন ছবি এঁকে দিলেন। তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সহকর্মীতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ'। আবার এই অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য অনুল্লেখিত থেকে গেলেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *পদাতিক*-এর ক্ষেত্রে। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে রঙের পরিবর্তন ঘটলেও মূল যে ছবিটি, হাঁটার ভঙ্গিতে দুই পা-এর ছবি, তা একই ছিল। তৃতীয় সংস্করণে ছবি পালটে গেল, এবং এই সংস্করণেই প্রথম পাওয়া গেল প্রচ্ছদশিল্পীর নাম, সোমনাথ হোড়। তারপর নানা সংস্করণে পূর্ণেন্দু পত্রী, গৌতম রায়, প্রাণেশ মণ্ডল, দেবব্রত ঘোষের প্রচ্ছদ।





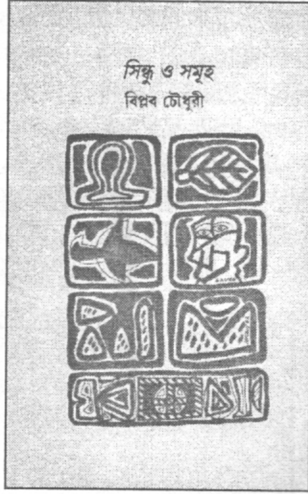


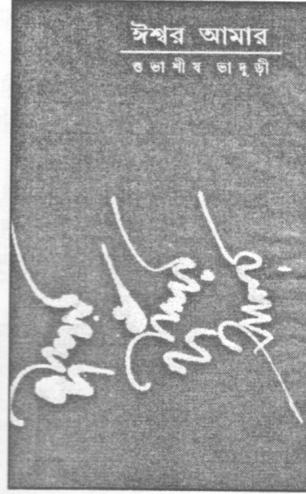
কবির প্রথম বই-এর ক্ষেত্রে প্রকাশক যেমন, তেমন প্রচ্ছদশিল্পীও। প্রকাশক হিসেবে অন্তত একটা ব্যক্তিনাম, কখনো হয়তো একটা সংস্থার নাম তবু থাকে, কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই শিল্পীর নাম থাকে না। অনেকক্ষেত্রে এইরকমভাবে বন্ধু-প্রকাশক, বন্ধু-শিল্পী আর কবি মিলে প্রচ্ছদ করায় হয়তো সেইভাবে কারো নামোল্লেখ থাকে না, তবে নাম-না-থাকার এই কারণটা বোধহয় ইদানীংকার। আগে যে নাম থাকত না, সেটা কিন্তু, শুনতে খারাপ লাগলেও, একপ্রকার উদাসীনতাই। যদি অতীতের দিকে তাকানো যায়, দেখা যাবে আজ আমরা যে 'প্রচ্ছদ' নিয়ে কথা বলছি, ঠিক সেই অর্থে 'প্রচ্ছদ'-এর ধারণা কিন্তু খুব বেশিদিনের নয়। এখন যেকোনো বই-এর মূল বিষয়টি শুরু হওয়ার আগে কয়েকপাতা জুড়ে যেসব তথ্য থাকে, সেই তথ্য-সম্বলিত প্রথম পাতাটিই ছিল তখনকার 'প্রচ্ছদ'। অর্থাৎ বই-এর নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম, ছাপাখানার নাম, উৎসর্গ, প্রকাশকাল, এমনকী অনেকক্ষেত্রে সূচিও থাকত। ধীরে-ধীরে একটি-একটি করে এই সব তথ্য চলে গেল মলাট ছেড়ে ভিতরে। রয়ে গেল বই আর লেখকের নাম। প্রথম যখন কিছু-কিছু তথ্য ভিতরে যেতে শুরু করেছে, তখন লেখকের ছবি বা দু-একটি ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক ছবি থাকত একেবারে মাঝখানে। স্বাভাবিকভাবে 'প্রচ্ছদশিল্পী'-র প্রয়োজন ছিল না। পরে যখন বই-এর শুরুতে ছবি বিষয়টা গুরুত্ব পেতে শুরু করল, এমনকী গুরুত্ব পেল 'নামাঙ্কন'-ও, তখন পুরাতনের জের টেনে অনেকক্ষেত্রেই বাদ গেল শিল্পীর নাম।

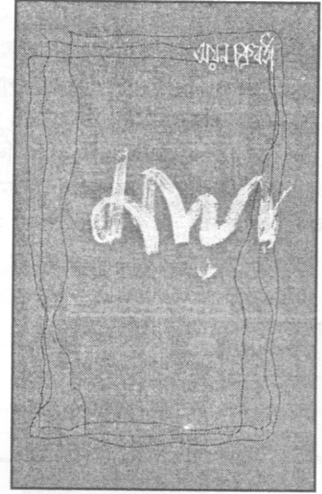
জীবনানন্দ দাশের *ঝরা-পালক* যথার্থ প্রচ্ছদেই শোভিত। বেশ পরিপাটি এর বিন্যাস। জলপাই রঙের জমির ডানদিকে আলাদাভাবে সাঁটা নীল রঙের উপর বই-এর নাম আর আটখানা ছোটো-বড়ো পালক ঝরে পড়ছে। 'ঝরা' ও 'পালক'-এর মধ্যের হাইফেনটিও ঠিক সোজা নয়, পালকের মতোই ঝরে পড়ার যেন প্রথম অবস্থা। কিন্তু কার করা এ প্রচ্ছদ? বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *বন্দীর বন্দনা*-তে (প্রথম সংস্করণ) কিন্তু লিখেছেন, 'বইয়ের প্রচ্ছদসজ্জা শ্রীঅনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের করা'। *বন্দীর বন্দনা*-র যখন দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়, তখন তার ভূমিকায় আবার

অরুণকুমার সরকারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *দূরের আকাশ*-এর প্রচ্ছদ বেশ অদ্ভুত। একেবারে উপরের দিকে রয়েছে একটা ছবি, নদী বা রাস্তা বাঁক খেয়ে চলে গেছে দূরের আকাশের দিকে, ছোটোনাগপুরের মতো টিলা আর স্বল্প গাছপালা আর এই ছবির নীচটা একেবারেই ফাঁকা। একেবারে নীচে কবির নাম। অদ্ভুতদর্শন এই প্রচ্ছদটি কার করা দেখতে গিয়ে হোঁচট খেতে হয়, কারণ কোনো নাম নেই। শঙ্খ ঘোষের প্রথম কাব্যগ্রন্থের সময়ে কবির ভীষণ আত্ম-অভিমান আর নিজের কবিতার প্রতি আস্থা, কবিতা দিয়েই আত্মপ্রকাশের বাসনা প্রচ্ছদের বাহুল্যকে যেন অস্বীকার করতে চায়। একেবারে সহজ প্রবেশপথ, শুধুমাত্র নাম, বই-এর আর কবির। *উর্বশী ও আর্টেমিস* নামের আকস্মিকতাই যেন থাকে প্রচ্ছদবিহীন বোর্ড-বাঁধাই বই-এ। পরের সংস্করণে পূর্ণেন্দু পত্রী অবশ্য কিছুটা অলংকরণ করেছিলেন, তবে তা-ও নামাঙ্কনের মধ্যে। পূর্ণেন্দু পত্রীই করেছিলেন সুনীলের *একা এবং কয়েকজন*। একইভাবে শুধু কবির নাম আর বড়ো হরফে ভেঙে-ভেঙে বই-এর নাম। জয় গোস্বামীর *ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ*-ও কিন্তু খুব সাধারণ মলাটে বেরিয়েছিল। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম বই *সমাচার দর্পণ*-এর সামনের প্রচ্ছদে উপরে-নীচে বই-এর আর কবির নাম। উল্লেখযোগ্য এর বর্ণাঙ্কনটি, '*সমাচার দর্পণ*'-এর সময়কার টাইপের ছাঁদেই এই নাম দু-টি। রঞ্জনদার বই-এর চতুর্থ প্রচ্ছদে (অর্থাৎ বই-এর পিছনে) রয়েছে একটি গোটা কবিতা।

আবার এর পাশাপাশি চলেছে যথাযথ প্রচ্ছদের ব্যবহারও। *ঝরা-পালক*-এর কথা, *বন্দীর বন্দনা*-র কথা, *পদাতিক*-এর কথা বলেছি (যদিও অন্য প্রসঙ্গে)... শঙ্খ ঘোষের *দিনগুলি রাতগুলি*-র হালকা নীলের উপর পুঞ্জ-পুঞ্জ গভীর নীল যেন 'লজ্জার আনীল বিষে মুখ তুমি ঢেকো না ঢেকো না।... বারংবার ঘুরে ঘুরে একই বৃত্তে অবিরাম সে এনেছে একখানি শুধু যন্ত্রণার ডালা'। প্রচ্ছদটি করেছিলেন পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় সংস্করণে অবশ্য প্রচ্ছদটি বদলে যায়, এবারে প্রচ্ছদ করেন পূর্ণেন্দু পত্রী। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য*-র প্রচ্ছদটিও ছিল

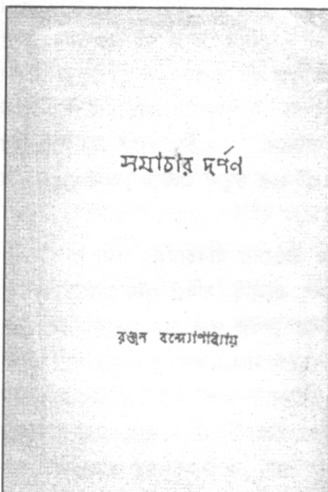


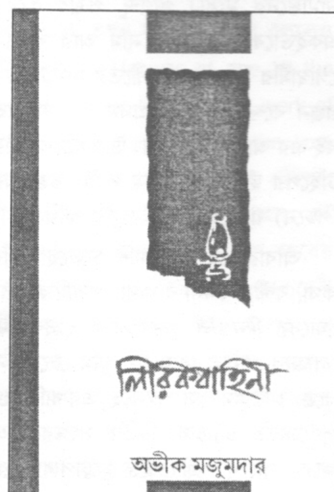




বেশ অভিনব। প্রচ্ছদপটটি দু-টি অংশে বিভক্ত। উপরের ছবিতে গাছের তলায় একটি মানব মুখ, 'একা-একাই তোমার বোনা গাছটি দেখবো ফুলটি দেখবো / বাগানে কোনো বড় গভীর ছায়ার তলায় ঘুমিয়ে পড়ব...', আর নীচের অংশের রং আরও গভীর আর উটের মুখের মতো একটা আদল, যেন উটের গ্রীবার মতো কোনো নিঃসঙ্গতা। দেবারতি মিত্রের *অন্ধস্কুলে ঘন্টা বাজে* বই-এর ছবিতে গাঢ় রঙের মধ্যে হঠাৎই যেন ঘন্টার শব্দ ছিন্নভিন্ন করেছে জমিকে, বই-এর ও কবির নাম যেন জড়িয়ে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ। সময় যত গেছে, তত যেন ভার কমাতে চেয়েছে প্রচ্ছদ। শুধু ছবির ক্ষেত্রেই নয়, নামাঙ্কনের দিক থেকেও *মরচে-পড়া পেরেকের গান* (বুদ্ধদেব বসু) কিংবা *উলঙ্গ রাজা*-র (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) পাশে যদি রাখেন ইদানীংকার কোনো প্রচ্ছদ, অনেক সহজ হরফে স্পষ্ট নামাঙ্কন; প্রচ্ছদে কোনো ছবি থাকলে পারতপক্ষে তাকে এড়িয়ে, নষ্ট না করে অনিবার্যভাবে জায়গা করে নেয়।

তবে প্রথম বই-এর প্রকাশক যেমন বন্ধু-বান্ধব, তেমনি অনেকক্ষেত্রে প্রচ্ছদশিল্পীও তাই। প্রথম বই-এর আবেগ এভাবেই জড়িয়ে নেয় আরেকজনকে, তারপর আরেকজনকে। রণজিৎ দাশের উক্তিটির মধ্যে সবচেয়ে ইনটারেস্টিং শব্দ হল, 'সাজতে', অর্থাৎ একজনকে প্রকাশক সাজতে হয়, তেমনি একজনকে প্রচ্ছদশিল্পীও সাজতে হয়। যদিও বুদ্ধদেব বসু অনিল ভট্টাচার্যকে 'বন্ধু' বলে উল্লেখ করেছেন, শুনেছি সুনীল বা উৎপলদের বন্ধু ছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী বা পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। এই সময়টা ছেড়ে এসে শেষ দু-দশককে ধরলে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিষয়টা।

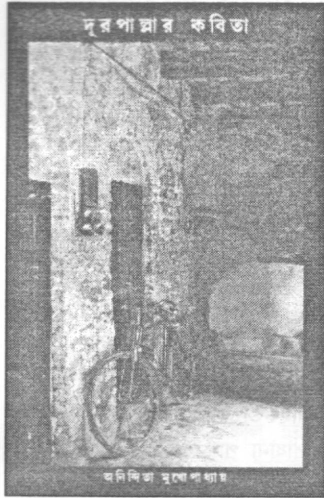


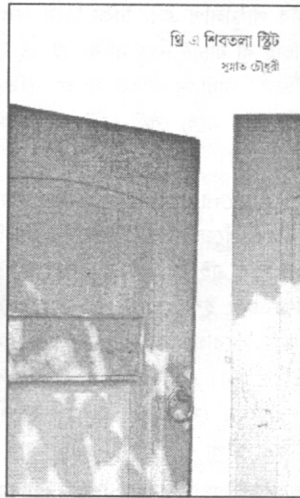


তন্ময় মৃধার *হাওয়া বাড়ি* বন্ধু অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়ের করা প্রচ্ছদ, বই প্রকাশের একটু আগে-পরে এ নিয়ে আবেগ-উচ্ছ্বাস তো দেখেছি, এর পরের তিনটি বই নিজেরই প্রচ্ছদে যদিও, কিন্তু তা অরিন্দমের সঙ্গে মনান্তরের কারণে বোধহয় নয়। অয়ন চক্রবর্তীর বই *মায়া*-র প্রচ্ছদ শুভাশীষ ভাদুড়ীর, ইট-রঙা জমির ওপর সরু তিনটি কালো দাগে তিনটি আঁকাবাঁকা আয়তক্ষেত্র, মাঝে শ্যাওলার মতো রঙে হালকা ছক, উপরে সাদায় তুলির টানে লেখা 'মায়া'। আবার শুভাশীষের বই *ঈশ্বর আমার*-এর প্রচ্ছদ সাম্যব্রত জোয়ারদারের করা। বিপ্লব চৌধুরীর প্রথম বই *সিন্ধু ও সমূহ* দু-ফর্মার পেপারব্যাক। বিপ্লবের প্রচ্ছদ মানস আচার্যের করা। যখন প্রকাশের প্রস্তুতি চলছিল, সে-সময়ে মানস 'মুখচেনা-আলাপ আছে' ধরনের বিপ্লবের কাছে, প্রচ্ছদের কাজ করতে-করতেই ভীষণ বন্ধুত্ব। অফ হোয়াইটের ওপর খয়েরি রঙে সাতটি চৌকোনা ক্ষেত্রে রয়েছে 'সিন্ধু ও সমূহ'। সার্থক রায়চৌধুরীর *অন্ধকারের অনুবাদ*-ও বন্ধুর প্রচ্ছদে, এ প্রচ্ছদের কথা সার্থক তো নিজেই বলেছে। অভীক মজুমদারের *লিরিকবাহিনী*-র প্রচ্ছদ করেছিল বন্ধুর বন্ধু প্রৈতি রায়। ছিমছাম ছবি। মধ্যিখানে উপর থেকে নেমে আসা কালো পটির মধ্যে একটি সেজবাতির ছবি। অভীকদার মন-মানসিকতার সঙ্গে বেশ মিলে গেছে প্রচ্ছদটা। প্রচ্ছদ সম্বন্ধে অভীকদার পক্ষপাতিত্বের কারণ শুধুমাত্র প্রথম কবিতার বই বলে নয়, বই প্রকাশের বেশ কিছুদিন পর, এমনকী আজও অনেকেই কবিতার বই-এর নাম হয়তো মনে করতে পারে না, কিন্তু রেফারেন্স হিসেবে ওই সেজবাতির কথা বলে, বলে : 'ওই লণ্ঠনের ছবি-দেওয়া কবিতার বইটি...'। মানুষ কিন্তু মনে রাখে প্রচ্ছদটি, বইটিকে চিহ্নিত করার জন্য। *Nine Notes on Book Covers* শীর্ষক লেখার দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ নোট দু-টিতে একই কথা বলছেন ওরহান পামুক —

- We cannot recall the books we most love without also recalling their covers.
- If, years after reading a book, we catch a glimpse of its cover, we are returned at once to that long-ago day when we curled up in a corner with that book to enter the world hidden inside.

বন্ধুত্বের টানে আমিও জড়িয়ে পড়েছিলাম প্রচ্ছদের কাজে। আজ অবধি যে তিনটি বই-এর প্রচ্ছদের সঙ্গে আছি, ঘটনাচক্রে তিনটিই তিনজনের প্রথম বই। একটি আমার, কিন্তু কবিতার বই নয়। বাকি দু-টি দুই বন্ধুর কবিতার। অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়ের আর সুস্নাত চৌধুরীর। অনিন্দিতার *দূরপাল্লার কবিতা* আবার ছেপেছিল *বোধশব্দ*-র পক্ষে সুস্নাত। সুস্নাতর পুরোনো বাড়ির বেশ কয়েকটা ছবি তুলেছিলাম, তারই একটি — জানলার গায়ে সুস্নাতর সাইকেলটা রাখা আর চারপাশে ইটের রং, খিলান, আলো-অন্ধকার মিলে ভালো লেগেছিল ছবিটা। ওই ছবিটাই





লেখকের করা দুই কবির প্রথম বই-এর প্রচ্ছদ

হয়ে গেল দূরপাল্লার প্রচ্ছদ। পরের প্রচ্ছদ হল সুস্নাতর *থ্রি এ শিবতলা স্ট্রিট*। এই যে থ্রি এ শিবতলা স্ট্রিট, এই বাড়িটারই ছবি ছিল অনিন্দিতার বই-এ কিন্তু সুস্নাতর বই-এর প্রচ্ছদে দরজার যে দুটো পাল্লা, তা আমার পুরোনো বাড়ির দরজা। দরজার মাথায় একটা শিউলি ফুলের গাছ ছিল, তার ছায়া কেমন রয়ে গেছে দরজার গায়ে। একেবারেই কাকতালীয়, কিন্তু আমি বা সুস্নাত, কেউই আর থাকি না প্রচ্ছদের ওই দুই ছবির বাড়িতে।

কথা তো হচ্ছিল 'কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ' নিয়ে। এই 'প্রথম' শব্দটাকে যদি একটু সরিয়ে দিই, যদি এরকম হয়, 'কবির কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রচ্ছদ' — তাহলে কী দাঁড়ায়! ধরুন, জীবনানন্দ দাশের *বনলতা সেন*। *বনলতা সেন*-এর প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ করেছিলেন শম্ভু সাহা। চারটে রেখায় চুল তার কবেকার বনলতা সেন। তবে নামাঙ্কনটি মনে হয় কবির নিজের। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদ সত্যজিৎ রায়ের। একবারে বিপরীত ধরনের; অজস্র রেখায় বনলতা সেন এবার সামনে থেকে। রবীন্দ্রনাথ ও যামিনী রায় মিশে আছেন। ঘোমটা দেওয়া। নাম ছাপার অক্ষরে। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র ক্ষেত্রে একইরকম ঘটেছে, ঘটেছে মৃদুল দাশগুপ্তের *জলপাই কাঠের এসরাজ* বা ভাস্কর চক্রবর্তীর *শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা*-র ক্ষেত্রেও।

প্রচ্ছদ শুধু বাঁধাই-এর সময়েই বাদ যায় না, প্রকাশকের ঘর পরিবর্তন হলে কেমন আশ্চর্যরকমভাবে হারিয়ে যায় একজন শিল্পীর কাজও। কবিতা তো একই থাকে, তাহলে মলাটের ললাটলিখন এত নিষ্ঠুর কেন?

তরুণ কবি, তরুণ বই

সৌরভ মুখোপাধ্যায়

তরুণ কবি প্রথম বই

সেই বছর আঠেরো আগে, সম্পূর্ণ একটা নতুন সাদা কাগজে কী অবিশ্বাস্যভাবে কতগুলো লাইন ফুটে উঠল, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে কয়েক মুহূর্ত আগে পর্যন্তও আমি সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম — সেই যে ক-টা লাইন, ক-টা অক্ষরকে সম্পূর্ণ আমার, হ্যাঁ আমারই ভাঙাচোরার ফসল বলে স্বীকার করে নিতে অস্বস্তি হচ্ছিল, একটা দোলাচলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, আবার প্রচ্ছন্ন যে একটা চাপা আনন্দ, চাপা গর্বও হচ্ছিল না তাতো নয়। তারপর যে সময়গুলো আস্তে-আস্তে চলে গেল, সাদা কাগজে কতগুলো লাইন ফুটে-ওঠাকে বিস্ময় থেকে অভ্যাসে পর্যবসিত করার চেষ্টায় লেগে গেলাম ক্রমাগত, সেই দিনটা প্রায় মুছেই গিয়েছিল ভেতর থেকে। আজ, বর্ষার একটা সকালে এ লেখাটা শুরু করতেই মনে পড়ে গেল সেই আঠেরো বছর আগের মুহূর্তগুলোর কথা।

একানব্বই-বিরানব্বই নাগাদ লেখালেখি শুরু করলেও, চুরানব্বই-পঁচানব্বই-এর আগে কোনোদিন ভাবতে পারিনি যে এগুলো আদৌ লেখা, বা লেখা হোক বা না-হোক নিজের বাইরে অন্যকে পড়ানোর মতো কিছু। সংকোচ তো কাজ করতই। ভাগ্যিস করত। কেননা বছর চারেক শুধু মকশো ছাড়া সম্পূর্ণ একটা লেখা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে কোনোদিনই হয়ে ওঠেনি। সেকারণেই কোনো পত্রিকাতেও কোনোদিন ছাপানোর কথাও ভেবে দেখিনি। যদিও আর পাঁচজনের মতোই ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার ইচ্ছে ষোলো-র ওপর সতেরো আনা। একদিন সম্ভবত *বর্তমান* পত্রিকায় একটা ছোটো বিজ্ঞাপন দেখলাম। *অন্বেষণ* বলে একটি পত্রিকা নতুন কবিদের কাছে কবিতা চাইছে। পত্রিকাটি সম্ভবত মেদিনীপুরের। পত্রিকাটি নতুন কবিদের কবিতা নিয়ে একটি বিশেষ সংকলন প্রকাশ করবে। বিজ্ঞাপনে আবার লেখা ছিল — 'সহজ শর্তে'। কপাল ঠুকে পাঠিয়ে দিলাম একটা লেখা। তখনও পর্যন্ত নিজের বিচারে সেরা লেখা! কী খারাপ যে ছিল সে লেখাটি! ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। তা যাই হোক — দিন পনেরো বাদে একটা পোস্টকার্ড পেলাম। মাননীয় সম্পাদক জানিয়েছেন, লেখাটি মনোনীত। মাস দুয়েকের মধ্যে একটি বইতে প্রকাশিত হবে। শুধু 'সহজ শর্ত' — পত্রিকাটি দশ বা কুড়ি কপি (ঠিক মনে নেই), সম্ভবত কুড়ি কপি আমায় কিনতে হবে। রাজি থাকলে ও একটি পোস্টকার্ডে তা জানালে, তাঁরা লেখাটি ছাপবেন ও নির্ধারিত কপি আমায় ভিপিপি করে পাঠাবেন। আমাকে টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে হবে। দিলাম জবাব। তখন ছাপার অক্ষরে নাম বেরোবে, এই ভেবেই রাতের ঘুম উড়ে গেছে — সামান্য কুড়ি কপি কেনা তো তুচ্ছ ব্যাপার। সাল সম্ভবত চুরানব্বই। পত্রিকার দাম পাঁচ টাকা। যথাসময়ে পত্রিকা এল। টাকা দিয়ে ছাড়ানোও হল। দেখা গেল চল্লিশ জন নতুন কবির লেখায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকা। তার মধ্যে জ্বলজ্বল করছে নিজের নামও। ওটাই দেখছি। তাহলে আমিও কবি হলাম। অন্তত *অন্বেষণ* পত্রিকা স্বীকার করেছে। কবিখ্যাতি নিজেকেই তাড়া করে ফিরছে। আর সেই তাড়ায় কুড়িটা পত্রিকাই দান করে দিলাম পরিচিতদের মধ্যে। আত্মীয়স্বজনদেরই প্রথম পাঠক বানানোর চেষ্টা।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। আমার স্বভাবগত আলস্যই তারপর থেকে আমাকে বারবার বিরত করেছে নিজে থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা পাঠানোয়। লিখে গেছি নিজের মতো। জমা করে রেখেছি ডায়েরির বিভিন্ন পাতায়। মাঝে-মধ্যে পড়ে শুনিয়েছি বন্ধুদের। কফিহাউস আর পত্রিকা কেনা-পড়ার সূত্রে আলাপ হওয়া কবি-অকবি বন্ধুদের। কোনো বন্ধু-পত্রিকা লেখা চাইলে, দিয়েছি। অনেকদিন পর-পর। কোনো দেখানেপনা বা আত্মম্ভরিতা নয়, স্রেফ আলস্যেই দেরি হয়েছে আমার। লেখাগুলো আদৌ হচ্ছে কিনা বুঝতে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই চলে গেছি শ্রী জয় গোস্বামীর কাছে। দিনের পর দিন তাঁর অসম্ভব মূল্যবান সময় নষ্ট করে শুধরে নিতে চেয়েছি আমার সামান্য লেখা। ভেবেও দেখিনি তাঁর অসুবিধে হচ্ছে কিনা। জয়দা পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন আমার লেখার ওপর। সাগ্রহে লেখা নিয়ে ছেপেছেন *দেশ* পত্রিকার কবিতা বিভাগে। এতদূরও ভাবিনি কোনোদিন। আমি মফঃস্বলের ছেলে, সামান্য লিখি। আমার লেখাও কোনো জনপ্রিয় পত্রিকায় ছাপা হবে, বার-বার ছাপা হবে, সত্যিই ভাবিনি। নিজের মতো করে লিখে গেছি। বই তো দূর অস্ত।

বইটাও জয়দারই প্ররোচনায়। নিরানব্বই সাল নাগাদ একদিন জয়দার বাড়িতে গেছি। বোধহয় নভেম্বর মাস। একথা-সেকথার পর জয়দা বললেন, শ্রী তরুণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর *প্রথম আলো* পত্রিকার পক্ষ থেকে একশো জন তরুণ কবির এক ফর্মা করে একশোটি বই করবেন। তাঁর নিজের খরচে। তুমি একটা পাণ্ডুলিপি জমা দাও। আমি তো ঘাবড়ে চৌপাট। আমার বই! কিন্তু জয়দা বললেন বলেই একটু ভরসাও হল। বাড়ি এসে হাঁটকে-পাঁটকে একটা কিছু খাড়া করলাম। আমার প্রথম বই-এর পাণ্ডুলিপি। নাম — *দৈবীকথন*। একটা সিরিজের আটটা

কবিতা, আর অন্যান্য ছ-টা কবিতা নিয়ে এক ফর্মার একটা গোটা বই। জয়দাকে দেখিয়ে জমা দিয়ে দিলাম শ্রী চট্টোপাধ্যায়কে। এমন হাসিমুখ প্রকাশক আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। একশো জন কবির বই-এর চাপ সামলে একজন প্রকাশক হাসছেন, এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা! তরুণদা হাসি-হাসি মুখে পাণ্ডুলিপি নিলেন, পাশে বীথিদি হাসি-হাসি মুখে ভরসাও দিলেন। আমি কী ভরসা পেলাম জানি না, ওঁর বাড়ি থেকে বেরিয়েই আমার মনে হল — যা! তিরটা হাত থেকে বেরিয়ে গেল! পাণ্ডুলিপিটা কিস্যু হয়নি।

বইমেলা ২০০০-এ আমার প্রথম বইটি প্রকাশিত হল। সে-এক কবিদের মহাসম্মেলন। কতজনের প্রথম বই যে বেরোল। আমি, শ্রীজাত, বিনায়ক, মিতুল — আমাদের সবার প্রথম বই। তরুণদা সম্ভবত দু-শো কপি করে ছেপেছিলেন। কী আশ্চর্য! এই বই-এর দামও পাঁচ টাকা। পাঁচ টাকায় একটা কবিতা ছাপা থেকে পাঁচ টাকায় চোদ্দোটা কবিতা। এটা কি উত্তরণ? তবে আমাদের সবাইকে অবাক করে সেই বইমেলাতেই অনেক বই-এর সব কপি শেষ হয়ে গিয়েছিল। মানুষ পাগলের মতো তরুণ কবিদের বই নিয়েছিলেন সেবার। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে সেই কপি-শেষ-হওয়া তালিকায় আমার বইটিও ছিল। আমি জানি না — কারা কিনেছিলেন, কেন কিনেছিলেন। শুধু এটুকু বিশ্বাস হয়েছিল, বঙ্গের পাঠক এখনও নতুন কবি, নতুন কবিতার বইকে সাদরে বরণ করে নিতে জানেন। বাংলা কবিতার ইতিহাসে এই যুগমুহূর্তে তৈরি করে দেবার জন্য *প্রথম আলো* প্রকাশনীকে কুর্নিশ। সেদিনও, আজও, আগামীতেও। বাংলা কবিতা চিরদিন মনে রেখে দেবে তাঁদের।

তরুণ কবির প্রথম বই

২০০৯ সালে *সপ্তর্ষি* শ্রেষ্ঠ প্রতিশ্রুতিমান প্রকাশক হিসেবে পুরস্কৃত হল। জ্ঞাপক *পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড*। উল্লেখ্য, এই পুরস্কার দেওয়া শুরু হল ২০০৯ সালেই, আর প্রথম বছরেই প্রাপক আমরা। আনন্দিত আমরা, উল্লসিত তো বটেই — কিন্তু তার সঙ্গে-সঙ্গে বেশ কিছুটা দায়িত্বও যেন চেপে বসল কাঁধে। এই যে একটা মোটামুটি ভালো অর্থমূল্যের পুরস্কার, এই যে প্রথম বছরেই আমাদের নির্বাচন করে নেওয়া, এটা কি অন্য কোনো একটা দিক নির্দেশের সূচনা করে না? প্রকাশন ব্যবসাকে পেশা করব, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাথে-সাথেই আমি আর স্বাতী ঠিক করেছিলাম, এমন কিছু কাজ করতে হবে যা আমাদের সময়কে তুলে ধরবে। এমন কিছু কাজ করব যার প্রয়োজনীয়তা আবহমান। এমন কিছু কাজ করার দরকার, যে কাজ অন্য কেউ করছেন না। অথচ সব সময় ইচ্ছে থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না। সাহিত্যের সেবা করতে গিয়ে স্রেফ অর্থাভাবে নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছে বেশ কিছু প্রকাশককে, এ আমাদের দেখা আছে। সাহিত্যকে সঙ্গ দেব নিশ্চয়ই, কিন্তু তা করতে গিয়ে যদি ভাঁড়ারে টান পড়ে, তাহলে তো মুশকিল। প্রকাশন ব্যবসা শুরু করেছিলাম ১৯৯৯ সালে। প্রথম থেকেই তরুণ বাংলা কবিতাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটছিলাম। ২০০৯-এর এই পুরস্কার আমাদের হাতে একটা বিরাট সুযোগ তুলে দিল। মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিলাম, এই টাকা এই মুহূর্তের এক ঝাঁক তরুণ কবির কবিতার বই-এর পেছনে ব্যয় করা হবে। আসলে ২০০৯-এর সামনে যে বছরটা, অর্থাৎ ২০১০, মানে, গোটা শূন্য দশকটা পড়ে আছে হাতের সামনে। পড়ে আছেন এক ঝাঁক সম্ভাবনাময় তরুণ কবি। যাঁদের তখনও পর্যন্ত কোনো বই প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু এঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁদের বই প্রকাশ করা অত্যন্ত জরুরি। বাংলা কবিতার স্বার্থে।

এরই মাঝে বাংলা কবিতার জগতে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হয়ে চলেছে অজস্র তরুণ কবির বই। যার নব্বই শতাংশই কবির নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়, কেননা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও নিজের বই নিজের খরচেই প্রথম দিকে প্রকাশ করতেন। কিন্তু এটা তো সত্যি যে এটা প্রকাশকদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে পড়ে — অজস্র কবির ভিড়ে 'কেউ-কেউ কবি'-কে খুঁজে বার করে আনা। খুব-খুব-খুব শক্ত কাজ, তবু এটাই আমাদের কাজ। কিন্তু সেটা মোটেই হচ্ছিল না। কবি পাণ্ডুলিপি এবং টাকা নিয়ে প্রকাশকের কাছে যাচ্ছিলেন, প্রকাশকও ঝাড়াই, বাছাই বা যাচাই কিছু না করেই বই ছেপে দিচ্ছিলেন দুমদাম। ফলে যা হবার তাই হচ্ছিল। সাধারণ পাঠক বাংলা কবিতা থেকে পিছু হঠছিলেন আর 'কেউ-কেউ কবি'-দের মধ্যে কেউ-কেউ অর্থের সঙ্গতি থাকলে পৌঁছলেন পাঠকের কাছে, না হলে ফক্কা।

আমাদের প্রথম লক্ষ্যই ছিল এমন বই, যা পড়ে পাঠক বাংলা কবিতার এই সময়কে খুঁজে পাবেন। প্রাথমিক একটি তালিকায় উঠে এলেন সত্তর জন। অবশ্য শর্ত ছিল এই যে, কবির একটিও বই থাকা চলবে না। বাংলার বিভিন্ন সাময়িক পত্রে এবং ইন্টারনেটে প্রকাশিত বাংলা কবিতা থেকে বেছে নিয়েছিলাম এঁদের। বাছাই করেছিলেন পঞ্চাশ থেকে নব্বই-এর কবিরা। দ্বিতীয় বাছাইতে এলেন, তিরিশ জন। এবং তৃতীয় বাছাইতে দশ। এই তিনটি বাছাই পর্বে আমরা এ-ও লক্ষ করেছিলাম যে কবির লেখা প্রকাশের ধারাবাহিকতা কতদূর। কবিতা লেখা না কবিতা ছাপা — কোনটি তাঁর কাছে অধিক প্রাধান্য পায়।

শীর্ষ বাছাইতে যে দশজন এলেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম আমরা। প্রত্যেকেই বিস্মিত এবং চমকিত। কেননা প্রকাশক নিজে থেকে তাঁদের বই করবেন, এটা তাঁদের কাছে নতুন খবর। প্রতিটি বই বত্রিশ পাতার। আমরা মনে করেছিলাম যে প্রথম বই হিসেবে বত্রিশটি পাতার মধ্যে কবি নিজের লেখায় পাঠককে ধরে রাখতে পারবেন কিনা এটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা। একসঙ্গে দশটি বই প্রকাশিত হবে। কোনোটির পাণ্ডুলিপি উপযুক্ত না হলে, প্রকাশক বই ছাপলেও পাঠক ক্ষমা করবেন না। সতর্ক না হলে প্রকাশকের ক্ষতি তো বটেই, লেখকদেরও সমূহ ক্ষতি। অতএব সাধু সাবধান!

আমরা চমকিত দিন সাতেক পর। শীর্ষ বাছাই দশ জনের মধ্যে ভাগ ছিল পাঁচজন তরুণ এবং পাঁচজন তরুণী। সমানুপাতিক বাছাই। তো, নির্বাচিত পাঁচ তরুণীর একজন জানালেন যে উদ্যোগটি খুবই সাধু, কিন্তু তিনি তাঁর প্রথম বইটি এই দশজনের ভিড়ে করতে রাজি নন। যদি আলাদা করে, চৌষট্টি পাতার বোর্ড-বাঁধাই বই প্রকাশক করতে রাজি থাকেন, তাহলে তিনি পাণ্ডুলিপি জমা করবেন। তিনি মনে করছেন, তাঁর লেখা যে মানে পৌঁছেছে, তাতে বত্রিশ পাতার বইতে তাঁকে আটকে রাখা অসমীচীন। তিনি মনে করতেই পারেন, কিন্তু আমরা স্বাভাবিকভাবেই এ প্রস্তাবে রাজি হইনি। অতএব, রইল পড়ে নয়। কিন্তু দশজন না হলে তো উদ্যোগটি সম্পূর্ণ হয় না। সে ক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় বাছাই কুড়িজনের মধ্যে থেকে বেছে নিলাম আর-একজনকে। তিনি প্রথম দফায় জানালেন, ভেবে দেখছি। দ্বিতীয় দফায় জানতে চাইলেন, অন্য কাদের বই প্রকাশিত হচ্ছে। এবং তৃতীয় দফায় জানালেন যে যেহেতু প্রথম দশ জনের মধ্যে তাঁকে বাছাই করা হয়নি, তাই তিনি রাজি নন এবং যাদের বই প্রকাশিত হচ্ছে তাঁদের থেকে তিনি লেখালিখিতে সিনিয়র, তাই...। আমরা বুঝলাম। জানলাম। আবার বাছাই আরও একজনকে। যদিও তিনি প্রস্তাবে সানন্দেই সম্মত হলেন।

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, যাঁরা কবিদের বাছাই করছেন, তাঁদের যোগ্যতা বা প্রকাশকদের বাছাই-এর যোগ্যতা সম্পর্কে। কিন্তু প্রকাশকদের তো এটুকু স্বাধীনতা রাখতেই হবে। এবার প্রকাশকের পরীক্ষা পাঠকের কাছে। এই তরুণ কবিদের প্রথম বই-এর ক্ষেত্রে প্রকাশক হিসেবে আমরা মনে হয় উতরে গেছি। বইগুলি প্রকাশিত হয়েছে ২০১০-এর গোড়ায়। এটা অক্টোবর। এই দশ মাসে যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দেখলাম 'তরুণ কবির স্পর্ধা' শীর্ষক এই সিরিজ ঘিরে, তা আশাব্যঞ্জকই বলতে হবে। প্রতিটি বই-ই দু-শো কপির অধিক বিক্রি মাত্র দশ মাসেই। এঁরা কেউ পরিচিত কবি নন, কোনো নামজাদা পত্রিকা এঁদের লেখা ছেপে এঁদের বিখ্যাত করেনি। বরং লক্ষ করার মতো এটাই, এবছরে বিভিন্ন নামজাদা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পূজাবার্ষিকীতে এঁদের অনেকে জায়গা করে নিয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক। এটা আমাদের কৃতিত্ব নয়, তাঁদেরই সাফল্য। আমরা হাত ধরেছি, এইমাত্র।

তরুণ কবির প্রথম বই। তার উৎসাহ তো সর্বাধিক। আমরাও যথাযথ মর্যাদা দিতে চেষ্টা করেছি তাঁদের। ভুল-ত্রুটি হতেই পারে। মানিয়ে চলার চেষ্টা করেছি দু-পক্ষই। কবিতা বাছাই বা পাণ্ডুলিপি তৈরি করার ক্ষেত্রে কবির মতামতই অগ্রগণ্য ছিল। তাঁর তৈরি করা রূপরেখাই আমরা অনুসরণ করেছি। দু-একটি ক্ষেত্রে হয়তো কোনো-কোনো কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর পছন্দের সঙ্গে আমাদের পছন্দ মেলেনি। আমরা অনুরোধ করেছি তাঁদের পুনর্বিবেচনার জন্য। আবার প্রচ্ছদ বা আকারের ক্ষেত্রে আমাদের মতামতকেই প্রাধান্য দিয়েছি আমরা। বুঝতে বা বোঝাতে চেষ্টা করেছি, প্রকাশনা, লেখক ও প্রকাশকের যৌথ সম্পর্কের এবং দাম্পত্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। একটি নতুন বই, লেখক ও প্রকাশক উভয়ের সন্তান। দাম্পত্য মধুর না হলে সন্তানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

এই কাজটাই স্বাভাবিক। কিন্তু হয়ে ওঠে না সবসময়। বিভিন্ন কারণেই হয় না। চেষ্টাটা জারি রাখা দরকার। যাতে সময়মতো বা সুযোগমতো কেউ অংশ নিতে পারেন। আজ আমরা, কাল হয়তো বা অন্য কেউ। নতুন বাংলা কবিতার জয়যাত্রায় কেউ না কেউ সামিল হবেনই। অনুঘটক হিসেবে কাজ করবেন। আমাদের মতো। বাংলা কবিতা পেয়ে যাবে উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রাকে।

শীতকাল কবে আসবে...

সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

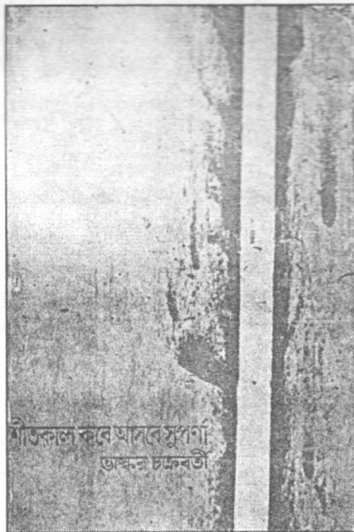
একজন কবির সব কবিতাবই-ই প্রথম কবিতাবই। কথাটা কি ভাস্করদার কাছেই শুনেছি? নাকি পড়েছিলাম কোথাও, তা আর মনে নেই। তবে কথাটা আশা ভরসার। এক আকাশ-ভরা অন্ধকার একটা-দুটো করে তারা ফুটছে — *পদাতিক, ফুল ফুটুক না ফুটুক, কাল মধুমাস*। *দিনগুলি রাতগুলি, নিহিত পাতাল ছায়া, পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ*। *পুরী সিরিজ, লোচনদাস কারিগর, সুখ দুঃখের সাথী*। *ক্রীসমাস, প্রত্নজীব, মৌতাত মহেশ্বর*। ...সব তারা প্রথম। আর এর উলটোদিকের কথাটা হল, একজন কবি সারাজীবন একটাই কবিতা লেখেন! একটাই কবিতা, সারাজীবন। তাহলে সব বইগুলোই হয়ে দাঁড়ায় খণ্ডত। আগের অথবা পরের সঙ্গে জোড়া। তার আবার শেষ শুরু হয় নাকি! রিলকের এক চিঠিতে এই 'প্রথম' ব্যাপারটা নিয়ে দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত ছিল। কোনো কিছু শুরু করা, সে এক আসুরিক শক্তির কাণ্ড। আমরা যদি আমাদের কথাবার্তা মাঝখান থেকে শুরু করতে পারতাম!

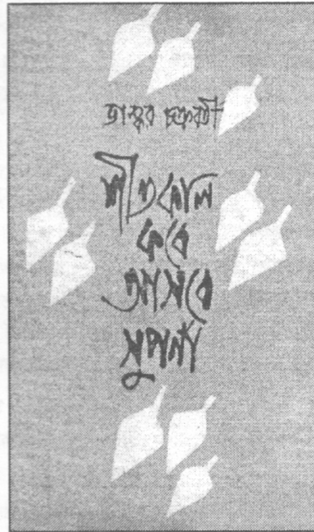
এই আসুরিক শক্তিটা সবসময় সবাই খুঁজে পান না। শক্তিটা যে ঠিক কোথায় আর তাকে লাগাতে হবে কোনখানে সেইটে বুঝবার আগেই প্রথম কাণ্ডটা ঘটে যায়। *ঝরা পালক* বা *তন্বী*-তেই এরকম যে শুধু দেখা গেছিল, এমন নয়। অনেকে আবার এই শুরুর শক্তিতেই শেষ করে ফেলেন সব জোর। এই প্রথমেই অনবরত শেষ হয়ে যান তাঁরা। আর কেউ-কেউ ওই একটিই বই লেখা চালিয়ে যান সারাজীবন। রাস্তায় আবার দেখা দিতে থাকে নতুন-নতুন বই-এর সুসংবাদ। পা ফেলতেই প্রথম বই পা তুললেই শেষ।

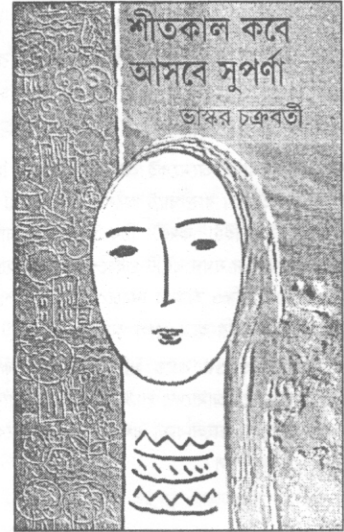
এ তো গেল যে লোক কবিতা লেখে, তার ঘরের খবর। যে পড়ে, তার দিকের কথাটা হল অন্য। কারো প্রথম বই বাজারে দেখা দেয় কেমন করে? নতুন কবির প্রথম বই-এর কোনো চাহিদা থাকে? যতই ইতস্তত ছড়িয়ে থাকুক লেখা, বই-তো আর তার সংকলন নয়। অর্থাৎ প্রথম বইটা চাহিদা-জোগানের বাইরের ব্যাপার। তাই অনেক সময়েই সে জনরুচি বা পাঠরুচি বদলে দিতে পারে। বাজারটায় চালু রাখতে পারে একরকম ম্যাজিকাল ফ্যাক্টর। আর যদি প্রথম চোটে সফল হয় দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দফায়, তা-ই হয়ে যেতে পারে কফিনের শেষ পেরেক। পাঠরুচির বিরোধ আর বিসংগতিটাও এখানে ভুললে চলে না।

আর থাকে কবির মতোই পাঠকেরও প্রথম কবিতাবই। একজন কবিকে কেউ ঐতিহাসিকভাবে প্রথমেই পড়ে না। ক্লাসরুমের কথা আলাদা। তাদের কথাবার্তা মাঝখান থেকেই শুরু হয়। আর সেই শুরুটা ভোলা যায় না। আমার প্রথম কবিতার বইগুলো যেমন *ছেলে গেছে বনে, লাইনেই ছিলাম বাবা, গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ, সলমা জরির কাজ, স্বপ্ন দেখার মহড়া, ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা?, বন্দরের কথ্যভাষা!* এরকম আরও। আর ২০১০ সালে যারা বাংলা কবিতা পড়বে বলে ঝাঁপ মারল, তাদের কাছেও এরকম সব প্রথম বই-এর নাম খুঁজে পাওয়া যাবে।

ভাস্কর চক্রবর্তীর প্রথম কবিতার বই *শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা* বেরিয়েছিল আজ থেকে ঠিক চল্লিশ বছর আগে। শীতকালেই। তখন ছেলেমেয়েদের সোয়েটার বা জামা-জুতোর রং-ই শুধু নয়, ভাবনাচিন্তাগুলোও অন্যরকম ছিল। কেউ ভাবত, পৃথিবীটা বদলানো যাবে। কেউ ভাবত, ভালোবাসা ছাড়া আর কাকেই বা যোগ্যতা বলে। দুপুরবেলা রাত্রিবেলা তারা আরও যে







শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা-র তিনটি সংস্করণের প্রচ্ছদ

কতকিছু ভাবত, কে জানে। তবে চারপাশে এই বইটা বেরোনো মাত্র বেশ হই-হই পড়েছিল। আর কী কাণ্ডই না তখন ঘটছে বাংলা কবিতায়! কী সমস্ত কবিতাবই! অনেকদিন পরে ২০০৩ সালের শরৎকাল নাগাদ যখন শেষ সংস্করণ (৩য়) হাজির হল তদ্দিনে সব বদলে গেছে। কবিতা লেখার আর পড়ার বাইরের দিকটায় এতখানি শীত নেমে এসেছিল যে কবির হাড় হিম হয়ে যাওয়ার দশা। আর যেখানে-যেখানে শীত পিছিয়ে পড়ছে সেই খবর কাগজের সংবাদ-শীর্ষে অথবা টুকটাক পত্রপত্রিকায় দেখা দিয়ে চলেছে — *শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা*।

মজার জিনিস হল ওই হাপিস হয়ে যেতে-যেতেই ভাস্কর দেখছিলেন দূর থেকে বইটার কাণ্ডকারখানা। কবিতা লিখে চলেছে যে লোকটা, যে ঢ্যাঙাটা ওই বেনেপাড়া লেনের ভেতর, ভাস্কর তাকে লক্ষ রাখতেন। গুছিয়ে রাখতেন কখনো বা। আর চাইতেন মেলামেশাটা আরো জোরদার হোক। শেষপর্যন্ত যেন আর ঝামেলা না থাকে। একটা মিশে যায় অন্যটায়। শব্দটাই সত্যি হয়ে ওঠে। জলজ্যান্ত মানুষটা যখন আস্তে-আস্তে ভ্যানিশ, ততদিনে ভাষাটাই যেন মানুষ হয়ে ওঠে। আমার মনে হয়, ভাস্কর পেরেছিলেন।

সেই বাইরের সঙ্গে ভেতরের বোঝাপড়া খানিকটা আজ এখানে তুলে দিলাম। নতুন দিনের কবিদের জন্য। কবিতা পড়েন যে-সব মানুষ, তাঁদের জন্য। খানিকটা সংক্ষেপ করতে হল। মনে-মনে সবাই নিশ্চয়ই সে-সব জায়গায় নিজেদের প্রথম কয়েকটা কথা জুড়ে নেবেন।

২

> 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' প্রথম প্রকাশ করেন কৃষ্ণগোপাল মল্লিক। উনিশশো একাত্তর তখন শেষ হতে চলেছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বইটার বোধহয় বয়স হলো একটু

এইভাবেই শুরু হয়েছিল *শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা*-র তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা। বইটি প্রথম প্রকাশ করেন *অধুনা* প্রকাশনের পক্ষ থেকে কৃষ্ণগোপাল মল্লিক। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে। সাদা-কালোয় প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন গৌতম রায়। উৎসর্গ — বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে। দাম : তিন টাকা। তিন ফর্মার এই বইটিতে কবিতা সংখ্যা চল্লিশ।

উনিশশো সাতাশি সালে, জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশ করে *প্রতিভাস*। সুব্রত চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদ — গাঢ় সবুজ, হালকা সবুজ আর সাদা রঙের। আট টাকা দাম। প্রকাশ সংক্রান্ত খুঁটিনাটির সঙ্গে এই সংস্করণেই জানা যায় *শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা*-র রচনাকাল — ১৯৬৫-৭১।

তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশক *দে'জ পাবলিশিং*। ১৪১০ শ্রাবণ (জুলাই ২০০৩) মাসে প্রকাশিত এই বই-এর প্রচ্ছদশিল্পী দেবাশিস রায়। হলুদ, খয়েরি আর কালো রঙের প্রচ্ছদ। দাম পঁয়ত্রিশ টাকা। এই তৃতীয় সংস্করণেই কবি একটি ছোটো ভূমিকা লেখেন। এখানে ভূমিকাটির বাকি অংশ উদ্ধৃত হল —

> প্রায় গত দশবছর, অনেকেই আমাকে, এমনকী চিঠিপত্র লিখে খোঁজখবর করেছেন বইটার। রাস্তাঘাটে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন কীভাবে বইটা পাওয়া যায়। বইটা, কথাটা ঠিক, পাওয়াও যাচ্ছিল না অনেক বছর। সুধাংশুশেখর দে যখন বইটি প্রকাশে উৎসাহী হলেন, আমি সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম, যদিও আমার নিজেরই আলস্যবশত পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে পৌঁছে দিতে দেরি হয়ে গেল আরও সাত-আট মাস।
>
> আমি সুধাংশুর কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ অরিজিৎ কুমারের কাছে। বইটাতো আমাদের পাঠকদের কাছে এবার সহজেই পাওয়া যাবে, কিন্তু পাঠকদের ভালোবাসা এখনও পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে একটু খট্‌কা থেকে গেল।
>
> — ২২ জুলাই ২০০৩

বইটির কোনো সংস্করণেই মুদ্রণ সংখ্যার উল্লেখ নেই এবং এই তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা অনুযায়ী মনে হয়, কোনো সংস্করণেই এই বই-এর তেমন কোনো বদল ঘটেনি। অথচ পরিবর্তন একটা হয়েছিল — বানানবিধিতে। দ্বিতীয় সংস্করণে, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*-এ গৃহীত কবিতাগুলিতে এবং তৃতীয় সংস্করণে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে যায়। বইটিতে এ প্রসঙ্গে কোনো উল্লেখ না থাকলেও, একটি সাক্ষাৎকারে ভাস্কর ওঁর মতামত জানিয়েছিলেন —

> প্রশ্ন : আপনার শ্রেষ্ঠ কবিতা যখন বেরোল দে'জ থেকে আর আপনার কাব্যগ্রন্থগুলো যখন বেরিয়েছে — আমরা একটা বানানভেদ দেখতে পাই। যেমন 'দ্যায়' থেকে 'দেয়', 'গ্যালো' থেকে 'গেল' ইত্যাদি বিভিন্ন উদাহরণ দেওয়া যায়।
>
> ভাস্কর : দে'জ-এর বই বলে হয়নি, এটা আমিই চেয়েছিলাম আর কি। আমার ভালো লাগছিল না। মনে হচ্ছিল যে, এটা ওভার-লোডেড হয়ে যাচ্ছে। ছাপার যে জিনিসগুলো, বেশি হয়ে যাচ্ছে একটা পাতায়। এগুলো আমি চাইছি না। চেয়েছি চেয়েছি, অল্প বয়সে চেয়েছি, আর ভাল্লাগ্‌ছে না এখন।
>
> — *বোধশব্দ*, ভাদ্র ১৪১৩

শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা প্রকাশের প্রায় তিরিশ-বত্রিশ বছর পরে, এই সময়ের কবিতা আর লেখালিখির সূত্রপাত নিয়ে লিখেছেন ভাস্কর *শয়নযান* বইটিতে।

> কেন লিখতে এসেছিলাম কবিতা? ছেলেবেলা থেকেই জীবন আমাকে যারপরনাই বিস্মিত করত। সকলেরই যেমন থাকে, আমার জীবনের পাশেও একটা আলো জ্বলত, মায়াবী এক আলো। আমার মতো — গরীব বাড়ির — এক পাঠবিমুখ ছেলের কাছে, কবিতা এসেছিলো মুক্তির আশা নিয়ে।
>
> — *শয়নযান*, পৃ. ৩৬

২০০৪ সালের ৩ নভেম্বরে গৃহীত একটি তথ্যচিত্রে ভাস্কর জানাচ্ছেন —

> ইচ্ছা ছিল নতুন কিছু করার, নতুন পথে যাবার; কিন্তু বাইরে তার জন্য হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি সে-সব ছিল না। ভেতর ভেতর ছিল।... ভাষা... হঠাৎ একদিন মনে হল যেন পেয়ে গেলাম এবং বিষয়ও আস্তে আস্তে এল...
>
> — *কবিতাদক্ষ ভাস্কর চক্রবর্তী*, স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
> *প্রতিবিম্ব*, নভেম্বর ২০০5

শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই কবির প্রতিক্রিয়া জানা যায় দু-একটি উল্লেখে —

> ওর বই শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা প্রকাশিত হলে... সে, ভাস্কর, ভাস্কর চক্রবর্তী, যখন কাউকে বইটা উপহার দিত, একটা খবরের কাগজের মলাট লাগিয়ে দিত। কেননা, প্রচ্ছদ ওর পছন্দ হয়নি। দেওয়ার সময়, ওর মুখে সহসা-মিলিয়ে যাওয়া যে হাসি দেখতাম, তার নাম আত্মপ্রত্যয়।
>
> — ভাস্কর চক্রবর্তী সম্পর্কে সুব্রত চক্রবর্তী
> উপমা বিপর্যস্ত সংখ্যা, ১৯৭৬

বইটির প্রকাশনায় যুক্ত ছিলেন দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। একটি লেখায় তিনি জানাচ্ছেন —

> তাঁর প্রথম বই 'শীতকাল কবে...' তখন যন্ত্রস্থ। এই বই সম্পর্কে তাঁর অনুভূতিপ্রবণতা এক আশ্চর্য স্তরের ছিল। অনেকেরই প্রথম বই সম্পর্কে মোহ থাকে, ভাস্করও 'শীতকাল' সম্পর্কে আশা-নিরাশার নাগরদোলায় উঠছিলেন-পড়ছিলেন।

শীতকাল... প্রকাশিত হওয়ার বছর তিনেক পর একটি বিজ্ঞাপন পাওয়া যাচ্ছে *প্রতিবিম্ব* পত্রিকায়। বইটির প্রকাশ-প্রতিক্রিয়ার একটা আঁচ সেখানে পাওয়া যাবে —

> রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'অপরকে বধ করবার জন্য ঢাল-তলোয়ার চাই, আপনাকে বধ করবার জন্য একটি ছুঁচ বা নরুণ হলেই হয়।' ৪৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে ৩৯ ও তৎসহ 'হারে রে রে' করে বেরিয়ে আসা আরও ৯টি,

মোট ৪৮টি ছুঁচ বা নরুণ আছে বা কবিতা। সরল ও দূরাগত ঐসব কবিতা এক অদ্ভুত বালকের মনোভার ও ধূসরতা যার সাপ্টা পটভূমিতে উৎকীর্ণ হয়ে আছে একজন নিত্যস্নানী, নিরাভরণ, চিরবালিকার নির্ঘাত ও জবর ইশারা। ঐ বালকের নাম ভাস্কর চক্রবর্তী এবং বালিকাটির নাম, হয়তো সুপর্ণা।

— *প্রতিবিম্ব*, ৪র্থ বর্ষ, শারদীয় ১৩৮১

প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই এই বই নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়ে যায়। *শীতকাল কবে আসবে...* এখনো পর্যন্ত ভাস্করের সর্বাধিক আলোচিত কবিতাবই। কয়েকটি নিদর্শন ও কবির কিছু প্রতিক্রিয়া এখানে উল্লেখযোগ্য।

১৫ জুলাই, ১৯৭২, *দেশ* পত্রিকায় সনাতন পাঠকের কলমে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন —

ভাস্কর চক্রবর্তী আগাগোড়া গদ্যছন্দে লেখেন। এর বইয়ের নাম, শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা। এই বইটি যেকোনো পাঠকের কৌতূহল আকর্ষণ করবে। কবিতাগুলি অপার রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন বলা যায়, অনেকদিন বাদে কেউ এরকম রোমান্টিক কবিতা লিখছেন, নির্লজ্জের মতন, অথচ ছন্দ বাদ দিয়ে, গদ্যে। ছন্দে হওয়াই যেন বেশি স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু এর গদ্য কোন বাধা সৃষ্টি করে না — কয়েকটি কবিতা পড়ার পর বেশ একটি মাদকতা সৃষ্টি করে। ...এঁর কবিতার মধ্যে আকস্মিকতা একটি বিশিষ্ট রীতি হয়ে উঠেছে। প্রথম কবিতার বইতেই ইনি একজন সার্থক কবি।

শীতকাল... যদিও 'আগাগোড়া গদ্যছন্দে' লেখা নয়, গদ্য ভাস্করের কবিতায় মস্ত এক জোর। এ প্রসঙ্গে কবির একটি সংলাপ উল্লেখ করা যেতে পারে —

অন্ত্যমিল দেওয়া কবিতা যে লিখিনি তা নয়, তবে একটা শক্ত পথে চলার ইচ্ছে হয়েছিল, একটা দুঃসাহস পেয়ে বসেছিল। ...গদ্য হলে আর কবিতা কি? তবু গদ্য কবিতা। আমি মনে করেছি আমি যেটা বলব সেটা গদ্যেই বলব। আমি যেটা বলতে চাইছি, ছন্দের খাতিরে, সেটা বলা না হয়ে অন্য একটা শব্দ চলে আসতে পারে। ঐ শব্দটা কবিতাটাকে ভাল করে দিতে পারে হয়ত, কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি তা তো বলা হল না। বা এরকমও হতে পারে, লোকে ভাবতে পারে, তুমি যদি বাপু ঐ মাপা ছন্দে ঐ মনের কথাটা বলতে না পার, তো তুমি কবি কিসের? ...তা আমি তো কবি নই। আমি কবিতা লিখি, কিন্তু কবি আমি নই।

ছন্দকে আমরা সেরকম গ্রাহ্য করিনি সত্যিই। কিন্তু এ তো সত্যি নয়। ছন্দ ছাড়া কবিতা হয় না। যেমন সরগম ছাড়া গান হয় না। একটা কঙ্কাল ছাড়া মানুষ কি করে সম্ভব? কিন্তু ঐ যে, ওটা ছাড়া চলবে না, এই না-টা, এই না-টা, এটাই আমি কেবল সরিয়ে দিতে চেয়েছি, দেখি আমি কতটা পারি, এখানেই আমার জোর পড়েছিল বেশি। তবে একটা কথা বলি, এটা আমার অভিজ্ঞতা, স্বরবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত বলুন আর যাই বলুন, মাপা ছন্দে কবিতা চলছে। কিন্তু গদ্যে লেখা, এই যে লেখা চলছে এর স্পন্দনটা... একটা ঢেউ উঠছে, অন্যটার সঙ্গে এটার ব্যালান্স করা, এটা মেনটেইন করা, চালিয়ে যাওয়া, এটা বেশ শক্ত ব্যাপার; কারণ আমি তো কোনও মাপা মিটার / ছন্দ পাচ্ছি না যে ছয়ের মধ্যে শেষ করতে হবে কিংবা ঢালাও আট আট ছয় / আট আট দশ। সুতরাং গদ্য কবিতা, সার্থক গদ্য কবিতা লেখা আমার মনে হয় বেশ একটু শক্ত।

— *কবিতা-দগ্ধ ভাস্কর চক্রবর্তী*, স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
নির্বাচিত ভাস্কর, পৃ. ১৮৫

আকস্মিকতা প্রসঙ্গে, ভাস্কর একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন —

সুনীলদা ঠিক আসল জিনিসটাই ধরেছিলেন, আর আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ওই লেখাটারই পরের লাইনে সুনীলদা লিখেছিলেন, 'প্রথম কবিতার বইতেই ইনি একজন সার্থক কবি'। সত্যি কথাটা স্বীকার করি, আমি বেশ আনন্দই পেয়েছিলাম। এই আকস্মিকতা যে কীভাবে আসে তা আমি নিজেও জানি না। তবে, আমার মনে হয়, কবিতার ক্ষেত্রে কোনকিছুই অপ্রাসঙ্গিক নয়। একটার-ভিতরে-আর-একটা কথা কাজ করে। একই কবিতা থেকে অনেকগুলো ডাইমেনশন বেরিয়ে আসে। আমি এই ধরনের কবিতার পক্ষপাতী। আমার কবিতা-বোধটা প্রথম থেকেই এ-রকম। যুক্তির থেকে অনেক দূরে থাকি আমি। যুক্তিটা যেন আমার কবিতার সাতমাইল তলা দিয়ে ঘোরাফেরা করে। ওপর থেকে মনে হয়, সব ছড়ানোছেটানো, একটু যেন ঘেঁটে দেওয়া হয়েছে। আমি এইরকম। এই খেলাটাই আমার খেলতে ভালো লাগে।

— *শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়, নির্বাচিত ভাস্কর*, পৃ. ১৭২

কবিতার এই নিজস্ব গড়ন বিষয়ে *শয়নযান* গদ্যগ্রন্থের একটি প্রাসঙ্গিক অংশও এখানে উদ্ধৃত হল —

কবিতা লেখার প্রথম থেকেই ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হতো — যে-কোন লাইন থেকেই একটা কবিতা শুরু হতে পারে, আর যে-কোন লাইনেই শেষ হয়ে যেতে পারে সেই কবিতা, কবিতা হবে আপাতসরল। হাজারমুখো। বিষয়ের কোনো বাছবিচার থাকবে না। আর কবিতার একটা লাইনের থেকে আরেক লাইনের দূরত্ব হবে কমপক্ষে একশো কিলোমিটারের। কিন্তু অদৃশ্য তলদেশে থাকবে মিলিমিটারের নিবিড় সম্পর্ক।

— *শয়নযান*, পৃ. ৩৯

শীতকাল...-এর লেখা নিয়ে *বোধশব্দ* পত্রিকায় (ভাদ্র ১৪১৩ সংখ্যা) প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে —

যখন 'শীতকাল...' লিখছিলাম তখন তো আমি এরকমভাবে ভেবে রাখিনি, লাইনগুলো এরকমভাবে সাজাব, এটা ভেতর থেকেই চলে এসেছে। সবচেয়ে মজার কথা কিংবা ভয়ের কথা এই, আমাকে ঐ সময়ের একজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী বলেছিলেন — 'তোমার কবিতার একটা পংক্তির সঙ্গে পরের পংক্তিটার একটা স্ত্রী আর পুরুষের সম্পর্ক আছে'। ...আমি তো খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

সুমেরু-কুমেরু (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০) পত্রিকায়, মানস রায়চৌধুরী *শীতকাল...*-এর সমালোচনা করেন। সেই লেখাটিতেই সম্ভবত এই উল্লেখ ছিল —

ভাস্করের কবিতার নায়ক নিঃসঙ্গ মানুষ, সঙ্গকামী মানুষ, কিংবা ব্যক্তির ভিতরে যে অনুভূতিপ্রবণ সমীক্ষক বিরাজ করে, সেই মানুষ। ভাস্কর চক্রবর্তীর লেখা অনেক নীচু সুরের, ডায়েরির পাতার মত গোপন ও অনুচ্চ সংলাপে ভরা, সর্বোপরি ব্যক্তিগত বিশ্বের রহস্যে সমাচ্ছন্ন। ...তার কবিতার বহিরাবরণ এক ধরনের মুখোশ যে মুখোশ, দু জন মানুষ-মানুষীর সম্পর্কের কথা বলে, মনে করায় আমাদের।

কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, *দৈনিক কবিতা*, সুকুমার রায় সংকলনে ভাস্কর চক্রবর্তী ও বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতা প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৭৩ সালে। কিছু দরকারি অংশ এখানে স্মরণীয় —

'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা'-য় ভাস্কর চক্রবর্তী তাঁর নিজের কথা একজন আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতাকে অকৃত্রিমভাবে প্রকাশ করেছেন।

...এই নিঃসঙ্গতার কারণ হলো বিচ্ছিন্নতাবোধ। একটি মানুষের সঙ্গে আরেকটি মানুষের বিচ্ছিন্নতা, একটি স্মৃতির সঙ্গে আরেকটি স্মৃতির বিচ্ছিন্নতা, এক ঘটনার সঙ্গে আরেক ঘটনার বিচ্ছিন্নতা। প্রতিমুহূর্তে দিনচর্যা এগিয়ে চলেছে, মানুষদের সঙ্গেও দেখা হচ্ছে রাস্তায় রেস্তোরাঁয়, প্রেমিকার সঙ্গেও দেখা হচ্ছে বা কখনো — এবং এই ঘটনাপুঞ্জ কবিতালেখককে আঘাত করছে, কিন্তু কোনো কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত গ্রথিত করছে না।

প্রণবেন্দুর এই লেখাটির ছাব্বিশ বছর পরে, *রক্তমাংস* পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকারে ভাস্কর *শীতকাল...*-এর বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে বলেন —

শীতকাল-এ বিচ্ছিন্নতার কথা ছিল। কিন্তু এটাকে শেষ সত্য বলে মনে হয় না। আমার কবিতায় এই বিচ্ছিন্নতার ছাপ রয়ে গেছে, কিন্তু এই

বিচ্ছিন্নতা থেকে আমি হাত-পা ছুঁড়েছি মানুষের কাছাকাছি, জীবনের কাছাকাছি থাকার জন্যে। বিদেশে, আমাদের সাহিত্যেও, অ্যালিয়েনেশন থেকে মহৎ সাহিত্য-সৃষ্টি হয়েছে, সর্বগ্রাসী অ্যালিয়েনেশন আধুনিক মানুষকে অর্ধেক মুখের মধ্যে পুরে ফেলেছে। আমার জীবনে, লেখালিখিতেও, এই অ্যালিয়েনেশন প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। তবু প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর একটা কথা ধার করে বলতে ইচ্ছে করছে, 'শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়'। এই প্রসঙ্গে বলি, ডাক্তারবাবু আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরীক্ষা করেও কোন অসুখ খুঁজে পাননি। আমার ছিল মানসিক ভারসাম্যহীনতার ভয়। বিচ্ছিন্নতা এই ভয়কে আরও উসকে দিত।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, ওই একই আলোচনায় ইমেজ, প্রতীকের ব্যবহার নিয়ে লেখেন —

> 'জুতো' ও 'বিছানা' ভাস্করের সর্বাধিক প্রিয় শব্দ মনে হয়, আটচল্লিশ পৃষ্ঠার বইটিতে 'জুতো' শব্দটি পনেরোবার ব্যবহৃত হয়েছে। 'বিছানা'-ও বহু ব্যবহৃত।

ভাস্করের নিজের টুকরো-চিন্তা সংগ্রহের খাতায় এ বিষয়ে এক লাইন লেখা আছে —

> জুতোকে, আমার কবিতায় জুতিয়ে কথা বলিয়েছি।

বোধশব্দ ও *রক্তমাংস* পত্রিকার উল্লিখিত সাক্ষাৎকারে ভাস্কর এই বিষয়ে জানাচ্ছেন —

> আমার প্রত্যেক বইতেই আমার জীবনের সঙ্গে, কিছু দৃশ্যের সঙ্গে, কিছু শ্রুতির সঙ্গে জড়ানো শব্দ এসে গেছে। হ্যাঁ, সারা বইতেই অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে (জুতো, বেড়াল, বারান্দা)। যেমন প্রণবেন্দুদা আমার সম্পর্কে একটা লেখা লিখেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, 'জুতো' শব্দটা উনচল্লিশবার 'শীতকাল...'-এ আছে। এখন, ঠিক উনচল্লিশবার লিখব বলে তো ওটা ওরকমভাবে লিখিনি, কিন্তু তখন যে জীবনটা আমার চলছিল, তাতে যা যা আমায় ক্লিক্ করছিল, সেগুলো চলে এসেছে। আমার মনে হয়, কেউ যে নাটক করছেন, ফিল্ম করছেন, কবিতা লিখছেন, এই যে বারবার কিছুর ফিরে আসা, এর থেকে কিছু কিছু কথা, ছবি, জিনিস পাঠকের কাছে অন্তরঙ্গ পাচার করা যায় এবং আরও একটা ডাইমেনশন দেওয়া যায়। যেমন 'এসো, সুসংবাদ এসো'-তে কতগুলো 'আন্তরিক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন 'ওগো'। 'ওগো' শব্দটা কিন্তু আমাদের সময়েও কেউ লিখত না। আমিই এটাকে জোর করে বারবার চালিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম।
>
> — *বোধশব্দ*, সাক্ষাৎকার
>
> হ্যাঁ, 'বিছানা' আছে। আমার একটা গদ্যের বইয়ের নামই তো শয়নযান। আমি বিছানামুখী। 'বিছানা' আমার কবিতায় আশ্রয়ের মতো। বিগত প্রেম, ব্যর্থতার স্মৃতি, আর বিছানা। যে-ভাবে চটিজুতো, ওষুধপত্তর, মরুভূমি, স্বপ্ন, দেবতা, মাস্টারমশাই, আমার কবিতায় বারবার এসেছে, বিছানাও এসেছে প্রায় সেইরকমভাবেই।
>
> — *রক্তমাংস*, সাক্ষাৎকার

'বিছানা' বিষয়ে তারিখহীন দিনলিপির এক চিন্তা-টুকরো এখানে স্মরণীয় —

> বিছানা আমার দ্বিতীয় মা
>
> — *নির্বাচিত ভাস্কর, দিনলিপির কয়েক পৃষ্ঠা*, পৃ. ৩২৪

কবি জয় গোস্বামী ভাস্করকে নিয়ে ওঁর স্মরণলেখটিতে *শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা* বইটির ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। সে লেখা উদ্ধৃত করেই আপাতত শেষ করা যাক।

> সেরকম কবি সর্বদাই দুর্লভ, যিনি নতুন একটি কাব্যভাষার জন্ম দিতে পারেন। ১৯৭১-এ প্রকাশিত ভাস্কর চক্রবর্তীর প্রথম বই 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' বাংলা কবিতায় একটি নতুন পথের সৃষ্টি করে। সেই পথ সৃষ্টির কৃতিত্ব কতটা, তা একটু বিশদ করা দরকার। 'শীতকাল...' বেরোবার আগের চার বছরে গায়ে গায়ে বেরিয়েছে শক্তির 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান' ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', শঙ্খ ঘোষের 'নিহিত পাতালছায়া', আলোক সরকারের 'বিশুদ্ধ অরণ্য', অলোকরঞ্জনের 'নিষিদ্ধ কোজাগরী' ও 'রক্তাক্ত ঝরোখা', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমি কীরকমভাবে বেঁচে আছি'। সুনীলের দীর্ঘ কবিতা 'কবির মৃত্যু' ছাপা হয়েছে আগের বছর '৭০-এ, অরুণ মিত্রের বই 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' বেরিয়েছে সে বছরই, শঙ্খের 'আরুণি উদ্দালক' ও 'জাবাল সত্যকাম' তারও আগে ছাপা হয়ে গেছে। উৎপল বসুর 'পুরী সিরিজ' যদিও এর বছর সাতেক আগের ঘটনা। পরের বছর '৭২-এ বেরোবে শক্তির 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই', পদাতিক সুভাষের 'ছেলে গেছে বনে'। অর্থাৎ এই সব বইয়ের কবিতা তখন পুরোদমে ছাপা হচ্ছে পত্র-পত্রিকায়। ছাপা হচ্ছে শরৎ মুখোপাধ্যায়ের তৎকালীন নতুন পরীক্ষা নকশা সিরিজ, এই '৭১-এই বেরোল নীরেন্দ্রনাথের 'উলঙ্গ রাজা', আল মাহমুদের 'সোনালি কাবিন' থেকে ১৪টি আশ্চর্য কবিতা। সে-বই বেরোবার আগেই মিনিবুক হিসেবে প্রচারিত হয়ে এ-বাংলার কবিদের হাতে হাতে ঘুরে চোখের নিমেষে দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেল এ-বছরই। আর এই বছরেই বুদ্ধদেব বসু প্রকাশ করে গেলেন তাঁর অন্তিম কবিতাগ্রন্থ 'স্বাগত বিদায়'। তিরিশের বর্ণচ্ছটা তখন সমাপ্তপ্রায়। বাংলা কবিতায় আজকের প্রবীণ জ্যোতিষ্কেরা যে যে গুণের জন্য আমাদের কাছে স্মরণীয়, শ্রদ্ধাস্পদ, এমনকী কখনো কখনো অনুসরণযোগ্যও হয়ে রয়েছেন, সেই সব গুণাবলির তথা তাঁদের কবিত্ব শক্তির যথার্থ ও সর্বোচ্চ বিকিরণকাল ছিল ঠিক-ঠিক সেই সময়টাই...
>
> হয়তো বোঝা যাচ্ছে, এতজন শক্তিধর কবি এতগুলি আলাদা আলাদা পথে যখন নিজেদের পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটাচ্ছেন, তখন কোনো নতুন পথ আবিষ্কার করা কতটা কঠিন। কিন্তু সেই সময়েই ২৬ বছরের ভাস্কর এলেন তাঁর 'শীতকাল...'-এর নতুন ভাষা হাতে নিয়ে। যেভাবে, বিলায়েত-আলি-আকবর-রবিশঙ্করের পূর্ণ ক্ষমতার বিচ্ছুরণের মধ্যেই ফুটে উঠেছিলেন স্বাতন্ত্র্যে অনন্য নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়।
>
> — *অপরাজিত কবিতা, আকস্মিকের খেলা*, পৃ. ৫৪

জীবনানন্দ দাশ

রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি

...প্রায় নয় বছর আগে আমি আমার প্রথম কবিতার বই একখানা আপনাকে পাঠিয়েছিলুম। সেই বই পেয়ে আপনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন, চিঠিখানা আমার মূল্যবান সম্পদের মধ্যে একটি। ...এবার আর একখানা বই বার করলুম। এ বইখানা আপনাকে উৎসর্গ করতে পারিনি। এই একটা লজ্জা ও দুঃখ আমার রয়ে গেল।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ভূমিকা : তন্বী

পরবর্তী কবিতাগুলোর উপরে স্বদেশী বিদেশী অনেক কবিই ছায়াপাত করেছেন — সব সময়ে গ্রন্থকারের সম্মতিক্রমে নয়। কেবল রবীন্দ্রনাথের ঋণ সর্বত্রই জ্ঞানকৃত। সত্য বলতে কি, সমস্ত বইখানা খুঁজে, যদি কোনওখানে কিছুমাত্র উৎকর্ষ মেলে, তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ ব'লে ধ'রে নেওয়া প্রায় নিরাপদ। তবু এই চুরির জন্যে আমি লজ্জিত নই, কেননা শুধু সুন্দরের মোহ যে-চোরকে পাপের পথে ডাকে, সে নিশ্চয়ই নীতিপরায়ণ নয়, কিন্তু রূপজ্ঞ বটে। ওই লুণ্ঠিত সম্পদের একটা বিস্তারিত তালিকা এইখানে দিতে পারলে, হয়তো, মহাবিদ্যার অপবাদটা অনেকখানি লঘু হত। কিন্তু সে-লোভ পরিহার করছি, কারণ পাঠকের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি আমার শ্রদ্ধা অগাধ। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় আনাতোল ফ্রাঁসের উপদেশ উল্লেখযোগ্য। তিনি একবার এক কবিযশঃ-প্রার্থীকে বলেছিলেন, ''পূর্বগামীর ঋণ কখনও স্বীকার কোরো না। সে-কৌশলে অধর্মের বোঝা তো তিলমাত্র কমবেই না, বরং হারাবে পাঠকের দরদ। পণ্ডিত ভাববে, তুমি করছ তার অখিল বিদ্যার প্রতি কটাক্ষ; মূর্খের মনে হবে তার অজ্ঞতা আর তোমার কাছে ঢাকা রইল না।'' উপরন্তু আমার অনুতাপে পাঠকের কোনও দাবি নেই, তাতে যাঁর অধিকার, তাঁর ক্ষমায় কিছুতেই বঞ্চিত হব না।

বিষ্ণু দে

ছড়ানো এই জীবন

আই-এ পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্সীতে না গিয়ে সেন্ট পলস কলেজে ভর্তি হই। স্কুলে থাকবার সময়েই প্রগতি, কল্লোল, ধূপছায়া, পূর্বাশা এই সব পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলুম। বাবা মাঝে মাঝে একটু বিচলিত হতেন — ''তুমি কাদের সঙ্গে মেশো? তারা তো বয়সে তোমার থেকে অনেক বড়ো। তুমি রাত আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে বাড়ি ফেরো না — এটা ঠিক নয়।'' আমি বলতুম, ''না, আমি তো আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই বাড়ি ফিরি।'' এবং ফিরতুমও। প্রগতির জন্য চাঁদা তুলে পাঠাতুম ঢাকায় বুদ্ধদেববাবুর কাছে। প্রগতি কোয়াটার্লি কাগজ। রাজশেখর বসু (আমার ন-জামাই বাবু, ভীষণ গম্ভীর, আমাকে খুব স্নেহ করতেন — আমাদের সকলকেই) তখন বেঙ্গল কেমিক্যালস-এর ম্যানেজার। বিজ্ঞাপনের জন্য চাঁদা দিতেন, তিন মাস অন্তর প্রগতির জন্য টাকা দিতেন। যখন সেকেন্ড ক্লাসে পড়ি তখন একটা মজার ঘটনা ঘটে। ন-দিদি (রাজশেখর বসুর স্ত্রী — ভালো নাম মৃণালিনী) এসে মায়ের কাছে বলেন — ''তোমাদের জামাই বলছিলেন বিষ্টু কি সব লিখছে — ওর বিয়ে দেওয়া দরকার।'' মা খুব বিচলিত হয়ে রাত্রে বাবাকে বললেন। বাবা আমাকে বললেন, ''তুমি কি সব লিখেছো — রাজশেখর বলেছে, তোমার ন'দিদি তোমার মাকে বলেছে।'' আমি বললুম, ''পড়ে দেখতে পারেন।'' প্রেমের কবিতা লেখা তো সব থেকে সহজ, আর আমি তো তখন নানারকম ছন্দ নিয়ে বাংলায় এক্সপেরিমেন্ট করছি — ট্রিওলেট, ভিলানেল, বালাদ — এই রকম নানান ফরাসী ও অন্যান্য ছন্দের ফর্ম। বাবাকে পড়তে দিলুম। বাবা বললেন — ''বুঝতে পারি না। তবে তোমাকে একটা কথা বলি — যখন তোমার সামনে প্রেমের কোনো অবজেক্ট নেই অবজেক্টলেস বিষয়ে কবিতা লেখা তোমার মনের একটা খারাপ অভ্যাস হয়ে যাবে না তো?'' তখন আমার মনে হয়েছিল বাবার একিউট অবজারভেশন-এ দারুণ পয়েন্ট ও ডেপথ আছে — উনি তো সাহিত্য বা ফিলসফি পড়তেন না, কিন্তু ওঁর এই মন্তব্যটা খুবই সত্য এবং লিটেরারি ক্রিটিসিজম-এর দারুণ কথা। বাবাই আমার প্রথম বই ''উর্বশী ও আর্টেমিস'' ছাপাবার টাকা দিয়েছিলেন।

বুদ্ধদেব বসু

কবিতার শত্রু ও মিত্র

এককালে কবিতার সঙ্গে আমার সরল একটি ভালোবাসা ছিলো। মনে একটা ভাব জাগে বা অস্পষ্ট কোনো কল্পনা, বা এমন কিছু ঘটে যার অভিঘাত আমার উপর তীব্র; আমি খাতা খুলে বসি, লাইনগুলো ঝরঝর ক'রে বেরিয়ে আসে। ভাবতে হয় না, কাটাকুটি অদল-বদলের বালাই নেই; এত স্বচ্ছন্দে আমার কলম চলে যে এক ঘন্টার মধ্যে একটি পঞ্চাশ লাইনের কবিতাও লিখে উঠতে পারি — অনায়াসে ও নিষ্কণ্টকভাবে। এমনি ক'রে লেখা হয়েছিলো 'বন্দীর বন্দনা', 'কঙ্কাবতী' ও 'নতুন পাতা'র কবিতাগুলো, আমার সতেরো থেকে পঁচিশ বা ছাব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে।

সমর সেন

বাবুবৃত্তান্ত

আমার কবিতা রচনার আয়ু অবশ্য বারোবছর — ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত, অর্থাৎ আমার আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত। প্রথম বই *কয়েকটি কবিতা* বের করি ১৯৩৭-এ স্বর্ণপদক বেচে, উৎসর্গ করি মুজফ্‌ফ্‌র আহমেদকে। আমার কবিখ্যাতির একটা কারণ — ইংরেজিতে ভালো ছাত্র ছিলাম। *কয়েকটি কবিতা*-র সমালোচনা করেন বুদ্ধদেববাবু, বিষ্ণুবাবু এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যথাক্রমে *কবিতা, পরিচয়* ও *অমৃতবাজার পত্রিকা*য়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

শাপভ্রষ্ট দেবশিশু

আমার 'পদাতিক' বইটি বার হওয়ার পর বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা'য় তা নিয়ে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন, ছাপা হওয়ার আগে সে সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও আমি জানতাম না। অথচ ততদিনে আমি 'কবিতা'র আড্ডায় নিয়মিত যাই-আসি।

...'পদাতিক'-এর আলোচনা 'কবিতা'য় প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন — অতি-প্রশংসায় ছেলেটির মাথা ঘুরে যাবে। নিজের মাথা ঘুরে গেলে নিজে টের পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। কিন্তু সমর সেনের মাথা যে ঘুরে যায়নি, সেটা আমি দেখেছি। আজকালকার নামী সম্পাদকেরা সেদিক থেকে অতিমাত্রায় হিসেবি; নতুন লেখকদের পাছে মাথা ঘুরে যায়, সেই জন্যে তাদের চুল পাকা পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করেন। অনেকে অপেক্ষা করেন লেখক টেঁসে যাওয়া পর্যন্ত। থুথু দিয়ে সাহিত্যে চিঁড়ে ভেজে না এই আপ্তবাক্য মনে রেখেও আমি বলব, নিরুপায় আশ্রয়ের চেয়ে নতুন লেখকদের লেখার পক্ষে বরং বেশি দরকার স্বাস্থ্যকর ঈষদুষ্ণ প্রশ্রয়।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

কবিতা ও আমি

আমার প্রথম কবিতার বই ''একঋতু''-তে অনেক বাসনা-বিধৃত, প্রেমের কবিতা ছিলো। তার পরেও আমি অনেক প্রেমের কবিতা লিখেছি (দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ''সদর স্ট্রীটের বারান্দা''-তে ''প্রেমিকাকে''-এই সিরিজে অনেক কবিতা আছে), কিন্তু প্রথম বইটির প্রেমের কবিতায় আমি শুধু প্রথানুগ শব্দসম্ভার ব্যবহার করেছি, নিজস্ব diction বা কণ্ঠস্বর এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি। ''এক ঋতু''-র শেষের দিকের কয়েকটি কবিতা ও 'সদর স্ট্রীটের বারান্দা'-র কবিতা থেকেই আমি নিজস্ব ভূমি খুঁজে পেয়েছি মনে হয়।

বিনয় মজুমদার

আত্মপরিচয়

আমার কোনো কবিতা আমি কোনো পত্রিকায় পাঠাতাম না। আপন মনে লিখে খাতাতেই রেখে দিতাম। দেবকুমার বসু আমার কবিতার বই প্রকাশ করতে রাজি হলেন। আমি তখন আমার পুরানো কবিতার খাতা ফের পড়তে লাগলাম। প'ড়ে মনে হলো, গোটা পঞ্চাশ কবিতার মধ্যে কবিতাপদবাচ্য বলা যায় গোটা পাঁচেককে। মনটা খুব দমে গেলো। তখন নতুন কিছু কবিতা লিখতে গেলাম। সব পয়ারে। বাছাই ইত্যাদি ক'রে অতি ছোটো একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করা যায় ব'লে দেখা গেলো। দেবকুমারবাবু অতি সজ্জন। তিনি বললেন, 'চলুন দেবুদার কাছে, মলাট এঁকে নিয়ে আসি'। চললাম তাঁর সঙ্গে দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে, বেলেঘাটায়। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মুড়ি খেতে খেতে তিনি একটা ছবি এঁকে দিলেন। অতি সুন্দর হলো দেখতে।

বই ছাপা হয়ে বেরোলো। মোটা ষাট পাউন্ড এ্যান্টিক কাগজে ছাপা। জানা-শোনা লোকদের কয়েকজনকে দিলাম পড়তে। কিন্তু কেউ আমার কবিতা সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য সুরু করলো না, প্রশংসাও করলো না। দেবকুমারবাবু নিশ্চয়ই বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায়ও দিয়েছিলেন। কেউ ভালো ক'রে রিভিউও করলো না। সব চুপচাপ, যেন আমার বই প্রকাশিত হয়নি। এ বইয়ের নাম 'নক্ষত্রের আলোয়'।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমি এখন যা লিখছি / আমার সমাধি তুমি চিনে রাখো

'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' আমার প্রথম পদ্যর বই। শেষ পর্যন্ত দেবকুমার বসু ছাপতে সক্ষম হয়েছিলেন। সম্ভবত ৫৭ সাল সময়টা। প্রথম ভেবেছিলুম নাম দেব, 'যম', তাহলে অবশ্য 'যম' পদ্যটা রাখতে হতো। তারপর দ্বিতীয় বিচারে সেই 'স্বাক্ষর' গিয়ে দাঁড়াল 'কেলাসিত স্ফটিক'এ। না, কেউই পুবের আলো দেখে নি। 'কেলাসিত স্ফটিক' হয়ে ছাপাখানায় টাইপ-গ্রথিত অবস্থায় ছ-মাস এক বছর থাকার পর তার মৃত্যু ঘটে। ছাপাখানার মালিক নির্মলবাবুর এখনও সে কথা নিশ্চয় মনে আছে। আমার মনে আছে আমি দীর্ঘকাল দেবুদাকে দেখলেই উল্টোমুখে হাঁটা দিতুম। মানুষের প্রথম পদ্যের বই নিয়ে এই হেলাফেলা পরে ভেবে দেখেছি পাপ। তবে, শান্তি আছে কোথায়? না, এই হেলাফেলা 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য'র জনক বলে। 'কেলাসিত স্ফটিক' দিয়ে শুরু হলে জীবনে আর 'কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে'তে পৌছুতে পারতুম না। নির্ঘাত জানি।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

মৃত্যুর অধিক খেলা

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তে একটি আন্দোলনে জড়িয়ে গিয়ে মাস দুয়েকের জন্য কয়েদখানা ঘুরে আসি। জেল থেকে ফিরে হঠাৎ লেখাপড়া ছেড়ে গ্রামোদ্ধারের সাধু সংকল্প মাথায় চলে যাই হাওড়ার পানিত্রাস স্কুলে মাস্টারি নিয়ে। দেউলটি স্টেশনে নেমে ম্যাল্লকের পোলগোড়ায় পা দিয়ে সামতাবেড়ে-তে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি পেরিয়ে বিরামপুর গাঁয়ে আমার এক সময়ের সহপাঠী চিত্তরঞ্জন পাঁজার বাড়ি গিয়ে মাস ছয়েকের জন্য থিতু হয়ে যাই। এই চিত্তেরই দয়ায় ও ভালোবাসায় ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয় আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সমুদ্র থেকে আকাশ'। ছোট্ট, ফর্মা দুয়েকের বই। সবুজ জমির ওপর চকোলেট রংয়ে বইয়ের নাম লেখা। আমার কাঁচা বয়স, কাঁচা প্রেম, আবেগ, রাজনীতি আটক রয়ে গেছে কার্টিজের দুটি নিরীহ মলাটের মধ্যে অদ্যাবধি আমার গোপন, লজ্জিত পক্ষপাতসমেত।

তারাপদ রায়

নিতান্ত নিজের মতো

আমার ঐ প্রথম বই 'তোমার প্রতিমা'র সবগুলি কবিতাই বাংলাদেশ নিয়ে। বাংলাদেশ মানে ভুবন মোহিনী মানে ছেলেবেলা। বইটি বেরিয়েছিলো উনিশশো ষাট সালে, কবিতাগুলি তারো দু-চার বছর আগে লেখা।

এমন নয় যে সেই সময় আমি সব কবিতাই বাংলাদেশের বিষয়ে লিখতাম। এখনকার মতই সেই সময়েও আমি নানা রকম কবিতা লিখতাম। 'আমাকে বাচাল যদি করেছো মাধব, বন্ধুদের করে দিয়ো কালা', আমার সেই সময়কারই কবিতা।

আগেই বলেছি বাংলাদেশ আমার প্রিয় বিষয়। 'তোমার প্রতিমা' বেরোনোর পরেও আমি বাংলাদেশ নিয়ে অনেক সময় অনেক কবিতা লিখেছি, এখন-ও লিখি। উনিশশো একাত্তর-বাহাত্তরে বাংলাদেশ নামক নতুন ভূখণ্ডটিকে নিয়ে প্রচণ্ড আবেগ ও উত্তেজনা দিয়ে, বাংলাদেশ শব্দটির মৃত্যুঞ্জয় মূল্য অনুভব করে আরো বহুজনের সঙ্গে আমিও আলোড়িত হয়েছিলাম। সে সময়ে দুটি অতি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলাম, আবেগময় ও বেদনাবহ, হয়তো তা একটু অসংবদ্ধ, সেই কবিতা দুটি এই 'দেশ' পত্রিকার পাতাতেই প্রকাশিত হয়েছিলো।

তবু স্বীকার করি, তোমার প্রতিমার সেই সুদূর কালের কবিতাগুলি সেই আমার প্রথম বই বহু কষ্টে, বহু ভালোবেসে ছাপিয়েছিলাম, আজ এতদিন পরে তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমার দ্বিধা অসীম। এক উদ্বাস্তু কিশোরের নিতান্তই ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা, কবিতার জন্যে সেই ব্যর্থ প্রয়াস কেবল আমার বুকের কাছে ছাড়া আজ আর কোথায় তার কি দাবি রয়েছে।

অনন্য রায়

অনন্যের সাক্ষাৎকার

'দৃষ্টি, অনুভূতি ইত্যাকার প্রবাহ এবং আরো কিছু', আমার ১৫/১৬ বছর বয়সের লেখা একটা তরল দীর্ঘ কবিতা। ওটাকে আমি এখন আমার নিজের লেখা বলে স্বীকারই করতে চাই না। খুবই নক্কারজনক কাজ। তবে হ্যাঁ, ১৯৭২ সালে বইটি প্রকাশিত হবার পর কয়েকজন প্রবীণ এবং অনতি-প্রবীণ কবি (যাঁদের মধ্যে বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অরুণ মিত্রের মতো কয়েকজন শ্রদ্ধেয় লেখকেরাও ছিলেন) যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন আমার, — বোধহয় আমার বয়েসটাই তখন আমায় গ্রেস মার্ক দিয়েছিল। নইলে ওরকম জঘন্য কবিতা আমি নিজেই দুটো পড়িনি। তবে তখন কবিতা লেখা, কবিতা পড়া কিম্বা অন্যান্য কবিদের সঙ্গে মেলামেশির মধ্যে এক রহস্যময় মাদকতা ও ডেডিকেশান ছিল। কোনো কবির সঙ্গে এক সন্ধ্যা আড্ডা মারলে নিজেকে অশেষ সৌভাগ্যবান মনে হতো। এক লাইন কবিতা লিখে মনে হতো, একটা কিছু হচ্ছেটচ্ছে বুঝি। তখন ছোট ছিলাম কি না।

— উদ্ধৃত এই লেখাগুলির বানান ও রূপ যথাসম্ভব অবিকৃত রইল।

যাঁদের প্রথম বই নেই

অথচ কত চরিত্রই তো আছেন, এ গল্পে যাঁরা ফিট করছেন না।
এমন কত প্রথম পাণ্ডুলিপিও তো থাকে, যা আর বই হয়ে ওঠে না।
এই বহুপ্রসবা ডিটিপি-ডিজিটালের স্বর্ণযুগে কী ভাবেন সেইসব কবিরা, আজও যাঁদের প্রথম বই নেই।
এ-সময়েরই এমন পাঁচ কবির না-বেরোনো প্রথম বই নিয়ে ভাবনা। আর কবিতা।

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের দেবতা ও চলমান ক্যামেরাধারী বীর সুশোভন

ওরা হার্মাদ... ওরা জলদস্যু... আমাদের প্রাণে মেরে... নারীর সতীত্ব লুট করে চলে যাবে সপ্তডিঙ্গা ভাইস্যা

এক ভয়াবহ স্বপ্নের তাড়সে তন্দ্রা ছুটে গেল শরতের জঙ্গলে। যুদ্ধজয়ের দামামা আসলে ঢাকবাদ্য। হাতে ধরা মুঠোফোনে আরাধ্যা দেবী মাতৃকা! গাড়ি এখনো ছুটছে ঠিকই কিন্তু আশু সাবধান! যেকোনো মুহূর্তে-ক্ষণ-পল-কাঁটায় মহাকাল এসে পথরোধ করে দাঁড়াতে পারেন! শ্যাওলা-লাগা কাঁঠল কাণ্ডের আড়াল থেকে। লতাঝিল্লির ফাঁক দিয়ে। খরস্রোতার অনতিঅতল ফুঁড়ে। পাহাড়ের বাঁকে! স্লেট পাথরের রঙে তাঁর গাত্রবর্ণ! তিনি বক্রতুণ্ড, মহাকায়! শাল্মল-সর্জ-অগ্নিবল্লভ-শিংশপা প্রভৃতি প্রাজ্ঞ ও বিশ্বস্ত প্রহরীকুলের ঘন-ঘন অভিবাদনের মধ্যে তিনি আবির্ভূত হবেন। যূথচারী বটে, কেননা তিনি একা থাকতে ভয় পেয়েছিলেন। তাই আজও আমরা একাকী ভয় পাই!

খণ্ড পাথরের গায়ে লাল মাটি লেপা... সিন্দুর লেপা, চকচকে পাথর। কণ্টকারক ও গুঞ্জা ফুলের অর্ঘ্যে সাজানো মনস্কামনা! সুতোয় বাঁধা চৌকাঠিতে অধিষ্ঠান করবেন পথের দেবতা। কিন্তু পুরোহিত কই? রম্ভা ও অন্নভোগ সবুজ পাতার পাত্রে নামিয়ে রেখে চলে যান ভক্ত। পথচলতি এসে দাঁড়ায় বনপথে হারিয়ে যাওয়া ক্ষুধার্ত কিশোর, কাঠকুড়ুনির মেয়ে, উৎসবের গন্ধ পাওয়া বুড়ো মজ-মাতাল, ভাগ্য-বিড়ম্বিত প্রেমিক, ছোপ-রং প্রজাপতি! শুরু হয় ভাণ্ডারা!

২

শোনো সুশোভন, এই পৃথিবীর সব ছবি সিনেমায় তুলে রাখা যায় না! ঘাড় থেকে গুরুভার ক্যামেরা তুমি এখানেই নামিয়ে রাখো! ক্যামেরা বরং চলতে থাকুক। কয়েক শতাব্দীর অতীত থেকে আগামী কয়েকশো বছর পর্যন্ত... পোড়া কাঠ, গনগনে ভূমা মাটি, ঝলসানো পশুমেদ — এক বিধ্বংসী দাবানলের শেষে স্রোতার জলে প্রথম জন্ম নিয়েছিল মাছ — যুবতী বর্ষার গর্ভে, শতাব্দী-প্রাচীন এক কাছিমের ঔরসে! তখন রৌদ্রে-মেঘে সোডা ও গন্ধক তীব্র বেগে ফুটে উঠে সিংহ-মেষ-উট একে-একে আকাশে ভাসিয়ে দিল! পথ কাটল গিরগিট। উড়ে এল দূর মরু-প্রান্তরের হাওয়া... ফুলের পরাগ... লোধ্ররেণু! পাহাড়ের ঢালু তলপেট বেয়ে পিছু-পিছু উঠে এল মানুষ। পশ্চিমের ঢালে যারা জড়ো হল, তারা 'হো'! লাল পালকে ওরা 'মুন্ডা'! এরা রায়কত বংশীয়! টাট্টুতে চড়ে এল হার্মাদ-বাহিনী — গোত্রভেদে জলচল বন্ধ!

এরপর সবশেষে আসবে কালান্তক শীত! যে প্রজাপতিরা এতদিন তোমায় সঙ্গ দিয়েছে, কোন অজানা আশঙ্কায় তারা খসিয়ে ফেলবে তাদের ডানা... ঝরনার জল হবে ধাতব... মানুষ কাঁপতে শুরু করবে, চিরকালের জন্য! তুমি সামান্য ক্যামেরাধারী নর সেই ছবি তুলে রাখতে যেও না। ভুলে যেও না, একবার নদীর জলে যারা রাতের পর রাত এক ঋতু থেকে অন্য ঋতুতে চাঁদ ধরতে গিয়েছিল, শুরু করেছিল অনন্ত প্রতীক্ষা, কী নিদারুণ হয়েছিল তাদের পরিণতি! শেষ পর্যন্ত হিসিয়ে গিয়েছিল বিষে... এক্কেবারে বদ্ধ উন্মাদ! তাছাড়া এত ছবি দেখবে কে? কে পড়ে এত পাত-পাত লেখা!

৩

মাকড়সা বুনেছে আব্রু জানলায় / ঘুমোয় মানুষ / আর দেখো শাগরেদ... দূরের আকাশে এক তারা / তুমি কোনো শব্দ করো না

সুশোভন আমায় আর ডেকো না! আমি খুশি নিয়ে সুখে আছি। খুশির সাজানো ঘরদুয়ার গতর-বতর সবই চমৎকার! অযথা ডেকো না! তোমার ডাকে দিনে-রাতে, শ্মশানে-রাজদ্বারে, উঠতে-বসতে-খেতে-শুতে আমার হাগা চমকে যায় — দিক বেভুল! আমি রান্নাঘর ভেবে বারান্দায় এসে থামি। সেখান থেকে বাদাবনের শুরু। ঢাল বেয়ে পাতার সর-সর। বাতাসে মড়কের গন্ধ, গলিত জলচর, পচনশীল উদ্ভিদ... কত শতাব্দী আগে নিঃশ্বাস ফেলেছিল কাছিম, গভীর কর্দম কণার বুক ভেঙে কেয়া গাছের রোম বেয়ে এইমাত্র উঠে এল বুদ্‌বুদ! ওপরে আকাশে একদঙ্গল বুড়ো লাল মেঘ। যেন কোনো ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে ছুটে এসেছে হাত নেড়ে পড়শিদের ডাক দিচ্ছে... ওই আবার ফিরে গেল। ঝোপগুল্মে, অন্ধকারে ঝলমল ফুঁসে উঠল বাগী এক মোরগের বুক! এত স্নায়ুচাপ... এত জমজমাট আবেগ, এ নিয়ে ছেলেখেলা করার এক্তিয়ার তোমায় কে দিয়েছে সুশোভন! ভালো চাও তো তোমার ডাক তুমি ফিরিয়ে নাও।

৪

কী আর বলার ছিল প্রিয় / দিনে দুটো মেসেজ পাঠিও

সুমন্তদা তোমার ডাক অনেক-অনেক দিন... তার পরেও অনেকদিন আর শুনতেই পাই না। শুনতে পাই, তোমাদের বাসাবদলের জোর খবর। গাটুসের প্রথম স্কুলব্যাগ, অমৃতাদির আইবুড়ো প্যাঁচকৌটো, তোমার নিজের কাঠপালিশ ও জলচৌকি... সব নতুন ঠিকানায় ঠিক-ঠিক পৌঁছেছিল তো? এই তোলন-নামন-পিছন-সামন-এর কাজে খোয়া যদি কিছু গিয়েই থাকে, তবে তা হবে অর্থহীন মেয়েলি রহস্যে ভরা সাড়ে তিন ফর্মার একটা খাতা, একজন পুরোনো কিশোরীর আস্ত মেয়েমানুষ হয়ে ওঠার হারিয়ে যাওয়া কতগুলো ধাঁধা... আমার প্রথম পাণ্ডুলিপি!

স্বদেশ

মুসলমান ও বাঙালির জন্য ভিন্ন গড়গড়া... টিভি
চলছে দিনরাত... হাতে-হাতে রুটি
সেঁকা... ঝুরো ময়দায় রকে একপাটি চটি চিহ্ন... দূরে দু-চারজন
মিটিং-মিটিং খেলছে খাটিয়ায়, আছে ইউনিয়ন
অফিসে ঝান্ডা... হাওয়া তত নেই... সবে সামান্য গরম
হল তক্তপোশ পাছা ঘসে। আর আছে তোমার আমার
ভিতরে-ভিতরে হয়তো চোরামিল। এখানে তেমন
চল নেই বৃন্দগান... তবে কথকতা হলে... ক্ষতফুল
কারো-কারো ভালো লাগবে, কান টেনে নিচ্ছে রিংটোন!

তুমি কেন মরে যাচ্ছ! পারো না কাটাতে ওইভাবে
আজীবন?

বস

ব্যবসার নাম যখন 'বিনোদন', তখন বস মানেই ১০০০ পাউন্ড ওজনের কোনো গেরিলা নয়, বরং রঙচঙে ও বুটিদার! গলায় নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত, মুখশ্রীটি চিরশিশু। আফটার শেভ সে ছটফটে। মাঝরাতে সে মানবদরদী। শেষ বিকেলের আলোয় তার প্রতিবাদী শিল্পীসত্তা। তিনটি মোবাইলে নাজেহাল, সঙ্গী ল্যাপটপ, পেপটিক আলসার, প্রেমে প্রতারিত ও সর্বোপরি মা-ন্যাওটা। পাশে কোম্পানির মেজবাবু। তিনি ক্যারাটে-বীর ও পিচ্ছিল। মেজবাবুর নত মুখে বাঁকা হাসি। তাঁর রক্ষিতার মাথায় গুঞ্জাফুলের মালা, গালে ব্রণ। আমার পেটের দায় মারাত্মক!

সুমিত দাশ

পলাশকাহন বা অন্য কোনো নাম

এখনো শব্দ ডাকে। নাগাড়ে। মনে-মনে চার ফর্মা, পাঁচ ফর্মা — ফ্রন্ট পেজ। একদিন বাক্য বুঝি জবুথবু হবে। মলমাসে প্রাণ পাবে নিপাট কাব্যগ্রন্থ। বৃষ্টি থাক, নাই বা থাক, নিখাদ নন্দীগ্রাম শব্দবন্ধে জেগে উঠতে-উঠতে উরিব্বাস! একব্যাগ কাব্যগ্রন্থ আর একবই পাঠক। না, আমার কোনও কাব্যগ্রন্থ নেই।

এখনো জ্যোৎস্না গান হয়। শহর চুঁড়ে নাগরিক ভাবনা বমি বা বন্দিশে টুকে রাখি। দিনচর্যা কলমকিড়ি লিটল ম্যাগের ছাপাপথ আজ আর চিঠিপত্র বোনে না। কবি ও কবিতার একেলে-সেকেলে উপপাদ্য চা বা চপের সাইড ডিশ নয়। বিশ্বাসই হয় না। সত্যি আমার কাব্যগ্রন্থ নেই। একটাও।

যত সময় যায় কাঠবাঁধাই আবছা হয়ে আসে। মিছিলের বাড়ি ফেরার মতো। নামের নীচে ভাবনামালা, শব্দ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কিনা — কী যায় আসে! একলপ্তে অত কথা, আজকাল কোথায়? জানো না আমার কাব্যগ্রন্থ নেই। সত্যি।

যিনি পারলেন তিনি পারলেন। আমার মতো যাদের পরীক্ষা দিতে ভয়, বাজারদর জানতে ভয়, বউকে পোয়াতি দেখতে ভয়, জানি না একটা কাব্যগ্রন্থ থাকলে ভালো হত কিনা! এ ফাঁকিবাজির মাঝে ভাগ্যিস খ্যাপাদা ছিল (খ্যাপাদা, সৌমিত্র বসু, সম্পাদক, *অন্যস্বর*)। মণিপুর থেকে ফেরার পর বলেছিল — বই চাই। পড়ুক পাঠক শর্মিলা-মনোরমাদের কথা। কবিতা কিনা বুঝিনি আজও। *উপত্যকায় চারদিন* প্রকাশ পেয়েছিল ২০০৫-এর বইমেলায়। মানে ময়দান। যতটুকু জানি, সে বই বিক্রি হয়ে গেছে সব। তবু কাব্যগ্রন্থ হলে আজও ভালো হয়। আমার কোনও কাব্যগ্রন্থ নেই। কেন নেই জানি না।

ক্লাইম্যাক্স

নেহাত কম সময় নয়। তেত্তিরিশটা বছর। অসংখ্য মহার্ঘ গাছের চেয়ে বেশি। বহুগুণী, বদলে দেবার রোখ চাপা দামালের চেয়ে বেশি — এ পরমায়ু।

এখনো চিতাকাঠের ডাক নেই। মাঝে-মাঝে মনে হয় ডেকে নিই জ্ঞানত। এই যখন কিচ্ছুটি করার নেই। অন্ধকার-অন্ধকার। অথচ সেখানে আলোর বীজে শুরু আর শুরু। ডাকে না বলেই চিতা — আলোর জপমালা গাঁথে না মৃত্যু আর এপিটাফ।

চাওয়া নয়, রীতি বলো। অভ্যাসের ধারাপাতে যতটুকু সঞ্চয়, তারও বেশি কথামুখ ঢেলে দিও — ইচ্ছে মতো। পছন্দেরও অভিসার থাকে। ওই যে একখণ্ড শুরু, মাখন আর মোমবাতি বাড়াবাড়ি হলে গলে যায় ভরা সংসার। এ ভরা বসন্তে নাগরিক পলাশগাছে হিজিবিজি এঁকে দেব কিন্তু! বাঁইসেপে চন্দনের ফোঁটা ঝুলিয়ে যদি কেউ গেয়ে ওঠো পলেস্তারা, আমি কথা দিলাম — ঘুলঘুলির চাঁদ হব। কত রং কত রং — শতরঙে মাখামাখি এ ধরিত্রী — সেজে থেকো। আলো হও নির্বিবাদী, স্বেচ্ছাচারী। কবিও শব্দ খাক। নিঃশব্দে লেখা থাক বসন্তবাহার। তারপর, কথামুখ ছুটুক আদ্রা থেকে নগর হাভেলি। পাদটীকায় সঠিক হোক উনিশে ফাল্গুন।

উঠোনের আশপাশ

আনমনে নতজানু হলে
শব্দস্রোত ধুয়ে দাও — জান
খোঁজো ধু-ধু বুক
যেখানে যাবার কথা ছিল
ফেরেনি কেউ।

জেনে যাক ঈশ্বরী
পাথর গাছ হয়ে সেও মানবী
মানবী কথা কও
রাখো মন বায়বীয় থানে।

বায়ু জল আর ফিরে আসার ফিরিস্তি টুকে
পদব্রজে বসন্ত আজ বৃষ্টি
ফিরে আসার মানে, একা লাগে
বড্ড একা।

জয়িতা দাশগুপ্ত

শূন্যের ভেতর যতদূর

ছাপার অক্ষরে নিজের নাম — অনেকের মধ্যে এক হয়ে নয়, এক এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্ হয়ে — এতে চূড়ান্ত একটা থ্রিল তো থাকেই। কিন্তু, খুব পষ্ট করে বলতে গেলে, এরকম কোনো বাসনা কোনোকালেই আমার নেই। নিজের ক্যালিবার সম্পর্কে আমি অত্যন্ত সচেতন, তাই কোনো নিষিদ্ধ দুঃস্বপ্নেও আমার প্রথম বই-এর প্রচ্ছদ বা টুকরো পাতা উড়ে এসে জুড়ে বসে না। প্রথম বই আসলে একটা নেভার-এন্ডিং স্পাইর‍্যাল সিঁড়ির স্টার্টিং পয়েন্ট — দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়, চতুর্থ হয়ে ইনফাইনাইট উর্ধ্বসীমার গল্প বুঝে ওঠার আগেই শেষ হয়ে 'সমগ্র'-এ পৌঁছে যাওয়া! 'লিমিট' এবং 'কনটিনিউইটি'-র এই খেলায় আমি ব্যর্থ, তাই পা পিছলোনোর হাত থেকে বাঁচতে আমি শূন্যতম ফ্লোরে থাকতেই পছন্দ করি। বিশ্বাস করি, অঙ্কের উত্তর হিসেবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংখ্যাটি হল — শূন্য!

একটি কবিতা

আলো কখনো দেখা যায় না, আলোয় দেখা যায়!
নিয়মানুগ ক্ষত আসলে নিজেই নিরাময়...
        ধোঁয়াশা-নীল আঁধারে ভিজে
        আগুনে পুড়ে, ব্যথায় পিঁজে
বস্তুত সব পাথর খোঁজে বশ্য পরাজয়।
চাঁদ শুয়েছে কার্নিশে আর জীবন বিছানায়...

আত্মগত অস্থিরতা মুখোশে টলমল
চোখের থেকে উছলে পড়ে তারা-পোড়ানো জল
        পোড়া ভিটের অংশবিশেষ
        সকল মানুষ দেখেছে বেশ
দেখেছে আর মুচকি হেসে কেঁদেছে ভাঙচুর।
প্রকৃত প্রেম প্রাজ্ঞ, তাই গিয়েছে বহুদূর —
অসুখ ছিল, ওষুধও ছিল, আরোগ্যের ছলে
আসলে আমি ওষুধ হতে পারিনি কোনোকালে...
        ভিনদেশি কোন সটান ব্যথা —
        গল্পকথা। কল্পকথা।
গেরস্ত-ঘর চেয়েছ মন! মায়ায় ঝিলমিল?
ঘরে তোমার দেওয়ালই নেই, খামোখা আঁটা খিল!

আরেকটি কবিতা

স্থির নদী... অধিকন্তু স্থির চরাচর
এখানে কেমন করে আবহমানের গল্প চলে!
পিঁপড়ে পৃথিবী হেঁটে পায়ের আঙুল থেকে চুলে...
শাড়ির আঁচল জুড়ে চোরকাঁটা বিছিয়েছি ভুলে!

রাজদীপ রায়

দারুণ গভীর থেকে

কেমন হবে সে? সত্যিই আমি জানি না। সন্তান জন্মানোর সময় মা-র সঙ্গে থাকে সন্তান জন্মের আনন্দ, আর মাতৃত্বের গৌরব। সেই সন্তান দেখতে কেমন হবে — কেমন হবে তার নাক — টিকালো না বোঁচা — এসব কল্পনার বুদ্‌বুদ।

চারিদিকে উড়ে বেড়ায়।

সবচেয়ে গভীরতর প্রশ্নময় শব্দটি বোধহয় 'মৌলিক'।

আমার সন্তান কি মৌলিকতার কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে? যদি পারে, নিজের বিশ্বাসবলে সে আজীবন ভেসে যেতে পারবে। সে নৌকায় আর যাই হোক, যাত্রীর অভাব হবে না। বিন্দু-বিন্দু প্রাণকণা জড়ো করে স্থির হবে তার আশ্চর্যের মৌতাত। আকুল বিস্ময়ে অপেক্ষা করে থাকব —

কখন মা হবে সে!
কখন নিয়ে যাবে হাত ধরে আমাকে তার নির্জনতম স্তনে।
বলবে, এখানে শ্বাস রাখো —
এখান থেকেই শ্বাস তুলে নাও —

ভারমুক্ত আমি শুয়ে থাকব তার শরীরে।

সে আমাকে সন্তান ভেবে ভাসিয়ে দেবে জলে...

বিসর্জন

জলের বদলে গায়ে হলুদ মেখেছ প্রতি রাতে
বিবাহের অপেক্ষা তোমার ছায়া সূর্য ঢাকা হাতে
অথচ আকাশে নেই বৃষ্টির লাজুক মুখ দেখা
দিগন্তে ভেঙেছে ক্রোধ, খুলিচিহ্ন এঁকে গেছে, একা

২
গান বাঁধো — বাঁধো গান, তখন ভুলেও বৃষ্টি হবে
জলের বদলে চাপ রক্তে ধুয়ে যাবে হত্যা বেদী
মাটিচাপা আগুনেই ধরা থাকে জ্যোৎস্নার ঋণ
ভুলে ছিলে, কতদূর, হৃদয় পুড়েছে সংবেদী

৩
ফুল নেই কোনো গাছে, সব ফুল হয়ে গেছে পাড়া
গাছে-গাছে লেগে আছে অন্ধকার, কেড়ে নেওয়া ক্ষমা
বিষ পুরে দিল গলা থেমে থাকা হতবাক কেউ
হলুদ-কলুদ বনে হারিয়েছে, ষোলোটি সুষমা।

৪
তোমারই তীর্থে আমি অপচয় সারাহাত মেখে
কুড়িয়ে ছোপানো ফুল ভুল করে জড়ো করে রেখে
নিহত বাকল হয়ে দেখে নেব, ঝরে যায় পাতা
ভোরের কুয়াশা ধুয়ে যেন, কেঁদে ওঠে আত্মীয়তা...

কৃষি

রোদে
চুল শুকিয়ে নিচ্ছে
মা...

রাজু দেবনাথ

আমার প্রথম বই

যেহেতু লেখালিখি শুরু করেছিলাম কবিতা দিয়ে তাই প্রথম বইটা কবিতারই হবে, সেটাই আপাতত ঠিক আছে। আর প্রথম কবিতার বই-এর ক্ষেত্রে সব কবির ভেতরে যেমন অন্যরকম একটা আবেগ কাজ করে, আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়!

অবচেতনের অনাবৃত স্তরকে ধীরে-ধীরে আবিষ্কারের ক্ষেত্রে, আমার লেখালিখি একটা মাধ্যমের মতো কাজ করে। আমি কবিতা লিখতে গিয়ে এমন অনেককিছুই লিখে ফেলি আর নিজেই বিস্মিত হয়ে উঠি এই ভেবে যে এইসব ধারণা, এইসব বোধ আমার ভেতরে কোন অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল? লেখালিখি না করলে যা আমার পক্ষে হয়তো কোনোদিনও জানা সম্ভব ছিল না। কবিতা লেখাটা আমার কাছে অনেকটা আত্মবীক্ষণ, আত্ম-অনুসন্ধানের পথ। কবিতা লেখার মধ্যে দিয়ে নিজেকে বোঝার অনবরত এই প্রয়াস প্রতিনিয়তই আমাকে নিত্যনতুন বাঁকের কাছে নিয়ে এসে হাজির হয়, আর সেই বাঁকে থাকে এক অদ্ভুত, অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ...।

আর সেইসব রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলোকে একই মলাটের মধ্যে এনে বই আকারে পাঠকের কাছে তুলে দিতে সব কবিরই সাধ হয়, আমারও সেই সাধ আছে। তবে সাধটা সাধ্যে রূপায়িত হতে হয়তো আরও কিছুটা সময় লাগবে...।

একটা কাঙ্ক্ষিত শব্দের জন্যে যেমন কোনো কবি উন্মুখ হয়ে থাকে, আমিও সেই দিনটির জন্যে অধীর আগ্রহে আছি...।

পর্ণমোচী

একটা-একটা করে ডানার পালক
খসে পড়ছে মাটিতে,
এখন নগ্ন অসহায়তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছো
একজন দুস্থ শিল্পীর মতো;
আকাশের দিকে বাঁকা আঙুল তুলে
এই শুকনো বাতাসে
এই শীতে!

ভাসান

নদীর জলে ঠোঁট রেখেছে একটা দুপুর
সর্বনেশে সেই ছোঁয়াতে জ্বর এসে যায়
বিপদ-জনক ঢেউগুলো সব তুমুল হলে
স্নানের মতো বৃষ্টি নামে আমার পাড়ায়!

আর্দ্রতাময় মনটা যখন আদিম মেঘে
বেপরোয়া স্বপ্নগুলোর মেলছে ডানা
ক্ষুধার্ত এক বাঘিনী ওই দিগন্তে বেশ
তৃপ্তি করে খাচ্ছে আমার হৃদয়খানা!

নিষিদ্ধ সেই ফুলের গন্ধ শিরায়-শিরায়
মাতাল করে তোমার গাঢ় চুলের নীচে
মান-অপমান সবকিছু আজ ভাসান দিলাম
'জ্যোৎস্না তোমার ঐতিহাসিক থাবার নীচে!'



